চাঁদমামা
সেপ্টেম্বর ১৯৭২
৭০
P

Photo by: SURAJ N. SHARMA

PRIME MINISTER

MESSAGE

Our children need books and journals which will awaken their minds to the marvels of creation and the living universe of ideas. Publications for children must arouse imagination, create aesthetic awareness, encourage the desire for knowledge and at the same time teach them to live in harmony with their own society and the world.

My good wishes for the continued success of "Chandamama".

New Delhi,
July 15, 1972.

(Indira Gandhi)

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি

নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

চাঁদমামা হাতে পেয়ে হাজার হাজার পাঠক খুশী। চাঁদমামায় প্রকাশিত গল্প সকলের ভাল লেগেছে। আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে বহু পত্রের ছত্রে ছত্রে। কিছু নতুন প্রস্তাবও এসেছে। ফটো-পরিচিতি-টীকা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যাও কম নয়। এবারের সংখ্যাতেও যক্ষপর্বত এবং স্বামীর খোঁজে আছে। এ ছাড়া চারজন পথযাত্রী, গুরু পরমানন্দের ঘোড়া, অন্যায় শাস্তি, রাজার জাতি, দুজন ভিখারী, ক্ষতি করতে গিয়ে, আলাভোলা, ধর্মদাতা, কুশল প্রশ্ন, বিনিদ্র রাজা প্রভৃতি মজার মজার গল্প রয়েছে। মহাভারত এবং শিবপুরাণও আছে।

খণ্ড ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সংখ্যা ৩

অমরবাণী

অহো প্রকৃতি সাদৃশ্যাম্
শ্লেষ্মনো দুর্জনস্য চ,
মধুরৈঃ কোপ মায়াতি,
কটুকৈ রূপ শ্যাম্যতি । ॥ ১ ॥

[দুর্জন এবং কফের স্বভাবে মিল রয়েছে । কফ যেমন মিষ্টিতে বাড়ে আর তেতোতে কমে, তেমনি দুর্জন ব্যক্তি মিষ্টি কথায় রাগ করে আর কড়া কথায় চুপ মেরে যায় ।]

দাতৃত্বম্, প্রিয়বক্তৃত্বম্
ধীবত্ব মুচিতজ্ঞতা,
অভ্যাসেন ন লভ্যন্তে,
চত্বার স্সহজা গুণাঃ । ॥ ২ ॥

[দানশীলতা, প্রিয়ভাষণ, ধৈর্য এবং ঔচিত্য এই গুণাবলী মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই প্রাপ্ত হওয়ার কথা, অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ার নয় ।]

অভুক্ত্বামলকম্ পদম্,
ভুক্ত্বাতু বদরীফলম্
কপিত্থম্ সর্বদা পথ্যম্,
কদলী ন কদাচন্ । ॥ ৩ ॥

[খালি পেটে আমলকী, খাওয়ার পর বদরী আর যে কোন সময় কয়েতবেল খাওয়া ভাল কিন্তু কলা কোন সময়েই খাওয়া ভাল নয় ।]

সংকলিত

চারজন পথযাত্রী

বিমলাবতী বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে এসে দেখল তার স্বামী ভীষণ বদরাগী। লোকটা বউয়ের জন্য কয়েকটা কড়া নিয়মকানুন বানিয়ে বউকে বলল, "তুমি ভুলেও কখনও অন্যের সাথে কথা বলোনা। নীরবে কাজ করে যাবে।"

বিমলাবতী খুব বুদ্ধিমতী। লোকের সাথে কথা বলার অভ্যাস তার ছিল। তার স্বামী তার জন্য যে কড়া নিয়ম চাপালো তা তার কাছে ভাল লাগলো না। তার কারণ হলো বিমলাবতীর বাপের বাড়ির পরিবেশ। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব তার বাপের বাড়িতে যাতায়াত করত। ওদের কথা সে শুনত। শ্বশুর বাড়ির চেহারা আলাদা। কোন আত্মীয় আসেনা। তার স্বামী যে বদমেজাজী তা গ্রামের সবাই জানে। তাই কেউ তার সাথে কথা বলত না।

একদিন বিমলাবতী পাড়ার বাইরের কুয়া থেকে জল আনতে গেল। জল তুলছে এমন সময় চারজন পথযাত্রী ঐ কুয়ার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ওদের খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল। তাই ওরা ওদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে যে সবচেয়ে বড় তাকে কুয়ার কাছে পাঠাল। আগে ও জল খাবে তারপর ওরা খাবে। ঐ যাত্রী বিমলাবতীর কাছে গিয়ে বলল, "দিদিভাই, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাওয়াবে?"

"কে আপনি?" বিমলাবতী জিজ্ঞেস করল।

"আমি এক যাত্রী।" বলল আগন্তুক।

"এই বিশ্বে শুধু মাত্র দুজন যাত্রী আছে। তৃতীয় কোন যাত্রী তো নেই;" বলে বিমলাবতী নিজের কাজে মন দেয়।

প্রথম যাত্রীকে জলপান না করে কুয়ার

কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্বিতীয় যাত্রীও সেখানে এলো। বিমলাবতী দ্বিতীয় যাত্রীকে বলল, "ইনি নিজেকে যাত্রী বলে পরিচয় দিয়ে মিথ্যা কথা বলছেন, আপনিও কি আর এক যাত্রী?"

সেও যদি নিজেকে যাত্রী বলে পরিচয় দেয় তাহলে তাকেও জল দেবেনা ভেবে সে বলল, "আমি এক গরীব মানুষ।"

"এই বিশ্বে মাত্র দুজন গরীব আছে। এছাড়া অন্য কেউ গরীব নেই। আপনার কথা, সঠিক নয়।" এই কথা বলে বিমলাবতী আবার নিজের কাজে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরে তৃতীয় যাত্রী কুয়ার কাছে এলো। বিমলাবতী তাকে জিজ্ঞেস করল, "এরা দুজনে নিজেদের যাত্রী এবং গরীব বলে মিথ্যা কথা বলেছেন, আপনি কে?"

"আমি এক মূর্খ।" তৃতীয় জন বলল।

"আপনিও মিথ্যা কথা বলছেন। এই বিশ্বে দুজনই মূর্খ আছে।" এই কথা বলে বিমলাবতী নিজের কাজে মগ্ন হয়।

শেষে চতুর্থজন কুয়ার কাছে এলো।

"আপনি কে দাদা? এই তিনজন নিজেদের যাত্রী, গরীব এবং মূর্খ বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন! অন্তত আপনার কাছ থেকে কি সত্য কথা শুনতে পাব?" বিমলাবতী জিজ্ঞেস করল।

"আমি বলবান।" চতুর্থজন বলল।

"এই বিশ্বে দুজনই বলবান আছে। আপনিও দেখছি মিথ্যা কথাই বললেন।" বলে বিমলাবতী কাপড় নিংড়ে নিল।

"আপনারা বেচারা খুবই তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণা মিটিয়ে এবেলা খাওয়ার জন্যও আসুন আমাদের বাড়ি।" এ কথা বলে বিমলাবতী ওদের জল খাইয়ে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

নিজের স্ত্রীর পেছনে চারজন পুরুষকে দেখে বিমলাবতীর স্বামী লাঠি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এরা কারা? তোমার পেছনে পেছনে আসছে কেন?"

"ওদেরই জিজ্ঞেস করুন।" বলে

বিমলাবতী ঘরের ভেতরে চলে গেল।

"মশাই, আমরা চারজন পথ যাত্রী। আমাদের ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। তাই আপনার স্ত্রীর কাছে কুয়ার জল চাই-লাম। উনি জল খাইয়ে খেতে ডেকে-ছেন। তাই আমরা এসেছি। লাঠি হাতে চোটপাট দেখানো আপনার উচিত হচ্ছে না।" যাত্রীরা বুঝিয়ে বলল।

"তোমরা মেয়ে ছেলের কাছে জল চাইছ, তোমাদের সাহস তো কম নয়!" এ কথা বলে বিমলাবতীর স্বামী ওদের উপর লাঠি তোলে। সঙ্গে সঙ্গে যে লোকটা নিজেকে বলবান বলে পরিচয় দিয়েছিল সে তার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিল। পরক্ষণে উভয়ের মধ্যে ঘুষোঘুষি চলে। মারামারির ফলে লোক জমে যায়।

ওদের মারামারির খবর রাজার লোক জানতে পেরে ওদের ধরে কোতোয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, "এরা প্রকাশ্য রাস্তার মাঝে ঝগড়াঝাটি করছে।"

কোতোয়াল ওঁদের প্রত্যেককে দশটা করে চাবুক মারার হুকুম দেয়। বিমলা-বতী সেই মুহূর্তে সেখানে এসে বলে, "কোতোয়াল মশাই, আপনার বিচার সঠিক নয়। আপনি আমার কথা না শুনলে আমি রাজার কাছে গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করব।

"যাও, যাও নালিশ করগে।" কোতো-য়াল ধমক দিয়ে বলল।

"বেশ, তাই যাচ্ছি আর যাচ্ছি বলেই
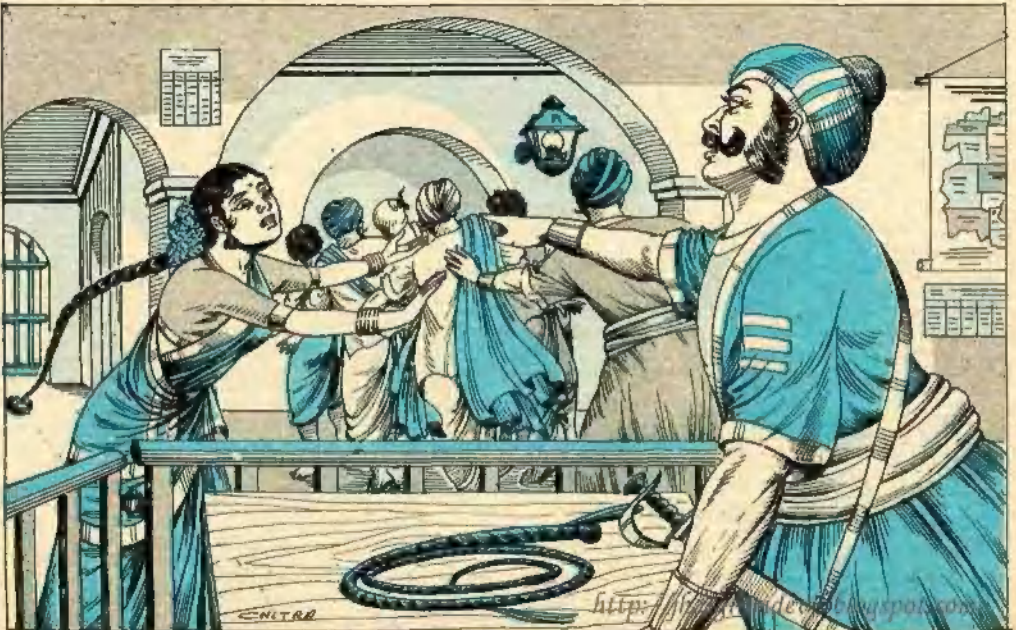
আপনার এখন চাবুক মারা চলবে না। আগে শুনুন রাজার বিচার।" বলে বিমলাবতী সোজা রাজ দরবারে গিয়ে রাজাকে বলল, "মহারাজ, কোতোয়াল মশাই, অকারণে আমার স্বামী এবং চারজন পথযাত্রীকে সাজা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আপনি কোতোয়ালের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করুন মহারাজ।"

রাজা কোতোয়াল এবং ঐ পাঁচজনকে ডেকে গোটা ব্যাপারটা জানতে চাইলেন।

"এরা কারা? কেন রাস্তার উপর ঝগড়া করছিল?" রাজা বিমলাবতীকে জিজ্ঞেস করলেন।

"মহারাজ, কোতোয়াল এই প্রশ্ন করে থাকলে আমাকে আপনার কাছে আসতে হোতনা।" বিমলাবতী জবাবে বলল।

তারপর বিমলাবতী আগাগোড়া যা ঘটছে তা জানিয়ে বলল, "এ ব্যাপারে অপরাধ শুধু আমার। আর আমাকে শাস্তি দেবার জন্যতো স্বয়ং আমার স্বামীই আছেন।"

"তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু তুমি যে এই পথযাত্রীদের বললে, এই বিশ্বে দুজন মাত্র যাত্রী, দুজনই গরীব, দুজনই মূর্খ আর মাত্র দুজনই বলবান আছে। এখন আমার প্রশ্ন এই দুজন কারা?" রাজা বিমলাবতীকে জিজ্ঞেস করলেন।

বিমলাবতী জবাবে বলল, "এই বিশ্বে সূর্য এবং চন্দ্রই সত্যিকারে যাত্রী। গরু এবং মেয়ে সত্যিকারের গরীব। বরুণ এবং বায়ু এই দুজনই বলবান। আসল কথা না জেনে যে শাস্তি দেয় আর বাড়িতে আসা লোকের উপর যে লাঠি তোলে, আমার চোখে এই দুজনই মূর্খ মহারাজ!" বিমলাবতী বলল।

রাজা বিমলাবতীর প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলেন। কোতো-য়ালকে তার ঐ কাজের জন্য বকলেন এবং বিমলাবতীর স্বামীকে স্ত্রীর উপর ঐ সব কড়া নিয়মচাপানোর ব্যাপারে কটাক্ষ্য করে বুঝিয়ে শুনিয়ে ওদের সবাইকে বাড়ি যেতে বললেন।
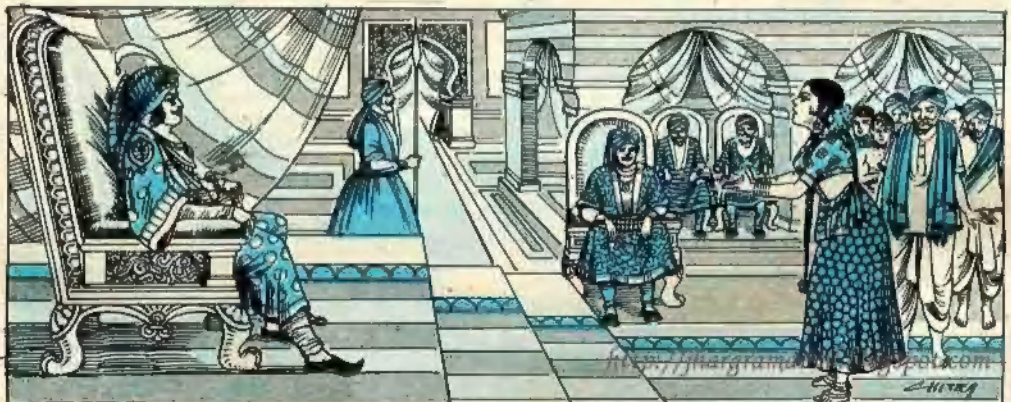
গুরু পরমানন্দের ঘোড়া

গুরু পরমানন্দ ও তাঁর শিষ্যদের কাণ্ডকারখানা যেমন হাসির তেমনি বোকামীর। একবার শিষ্যদের নিয়ে মঠে গুরু বসে আছেন। কথাবার্তা চলছে। এক শিষ্যের মনে একটা কথা জাগল। শিষ্য তার সাথীদের বলল, "আমাদের গুরু কত বড় একজন মহান ব্যক্তি। এমন কোন বিদ্যা নেই যা উনি জানেন না। উনি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে কত কষ্ট হয়। তাই আমাদের উচিত কোন না কোন ভাবে তাঁর জন্য একটা ঘোড়া কেনা।"

প্রত্যেকে একথা শুনে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। শেষে সবাই এই প্রস্তাব মেনে নিল। গুরু পরমানন্দও শেষে নিজের সম্মতি জানিয়ে বললেন, "তোমাদের মত শিষ্য থাকতে আমার আর কিসের ভাবনা।"

দুজন শিষ্যের উপর এই কাজের ভার দেওয়া হোল। তারা যেন চমৎকার লম্বা চওড়া ঘোড়া দেখে কিনে আনে।

দুই শিষ্য ঘোড়া কিনতে বেরিয়ে পড়ল। অনেক দূর যাওয়ার পর এক সবুজ ফসলের ক্ষেতে চমৎকার পাঁচ-ছটা ঘোড়া চরছে নজরে পড়ল। ঐ ক্ষেতে বড় বড় কুমড়ো ফলে ছিল। ঐ কুমড়ো দেখে এক শিষ্য বলল, "আরে ভাই, ঘোড়া কিনতে তো খরচ কম হবেনা। তার চেয়ে এই ঘোড়ার ডিম পড়ে রয়েছে। ভাল আর বড় দেখে একটা ডিম কিনে নিয়ে গিয়ে তা দিতে পারলে গুরুর জন্য অল্প খরচে একটা ভাল ঘোড়া হয়ে যাবে।" দুই শিষ্য গুরুর কাছে ফিরে এসে আবার বলল, "গুরুদেব, এক জায়গায় দেখলাম অনেক

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ঘোড়ার ডিম গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঐ ডিম কিনে তা দিতে পারলে অতি অল্প খরচে বাচ্চা পাব। আপনার কি নির্দেশ গুরুদেব?"

"বা! বা! চমৎকার! ভাল কথা, ঘোড়ার ডিম তা দেওয়া হবে কি করে?" গুরুর প্রশ্ন।

শিষ্যরা আলাপ-আলোচনা করে শেষে ঠিক করল প্রতি দিন এক একজন শিষ্য ডিমের উপর বসে বসে তা দেবে। শেষে ঐ দুজন শিষ্য টাকা নিয়ে সেই খেতে গিয়ে কিষাণকে বলল, "মশাই ঘোড়ার এই ডিমগুলোর দাম কত করে?"

"মাত্র কুড়ি টাকা!" ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কিষাণ বলল। তাই দিয়ে একটা বড় কুমড়ো মাথায় করে নিয়ে হাঁটা দিল শিষ্যরা। চলতে চলতে এক জায়গায় একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে নিচে পড়ে গেল। কুমড়োও নিচে পড়ে ফেটে দুভাগ হয়ে যায়। ঠিক সেই জায়গায় বনের মধ্যে থেকে একটা খরগোশ একলাফে বেরিয়ে আবার ছুটে পালাতে লাগলো।

"আরে, এতো সর্বনাশ হোল। চোখের পলকে ডিম ফেটে তার ভেতর থেকে বাচ্চা বেরিয়ে ছুটে পালাল। কী তীব্র গতি তার। ওরে বাবা ডিম থেকে বেরিয়েই যে বাচ্চার এত গতি সে বড় হোলে হয় তো মেঘের বুকেই উড়ে উড়ে বেড়াবে।" এসব কথা বলাবলি করতে করতে গুরু পরমানন্দের দুই শিষ্য ঐ খরগোশকে ধরার জন্য তার পেছনে ছোটাছুটি করতে লাগল। কিন্তু খরগোশ কিছুক্ষণ পরেই জঙ্গলে কোথায় যে পালিয়ে গেল ধরতে পারল না।

শিষ্য দুজন তো ক্লান্ত হয়ে গেল। এক জায়গায় বিশ্রাম করল। আস্তে আস্তে মঠে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার গুরুকে জানাল।

"এক কাজ কর। ঘোড়া থাক। আমার কপালে ঘোড়ায় চড়া নেই তার আর কি হবে।" এই সব কথা বলে গুরু শিষ্যদের সান্ত্বনা দিলেন।
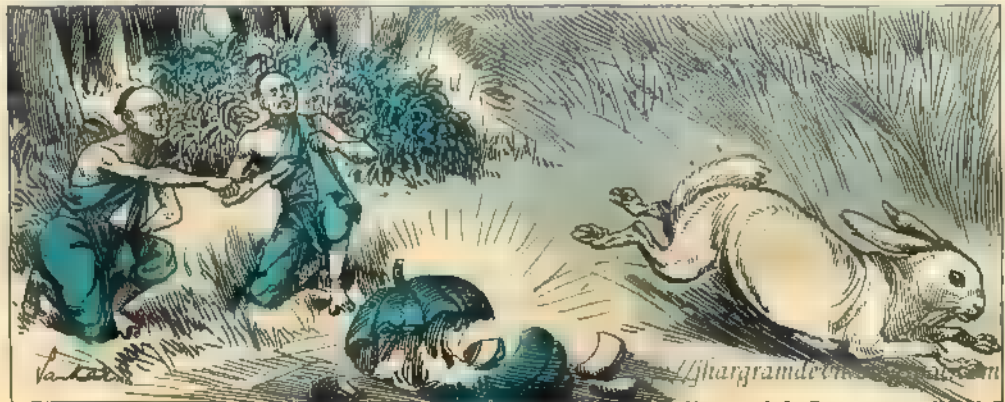
যক্ষপর্বত

দুই

[গণ্ডক জাতের মানুষের ক্ষেতের ফসল লুণ্ঠনকারীদের নিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে গণ্ডক জাতের লোক নিজেদের মন্ত্রীর নেতৃত্বে লুণ্ঠনকারীদের মোকাবিলা করতে গেল। সেই সময় গাছের ডালে বসে একজন সাহস জোগাতে যাবে এমন সময় লুণ্ঠনকারীদের নেতা বল্লম তুলে ঐ লোকটাকে নীচে নামার হুকুম করল। তারপর...]

লুণ্ঠনকারীদের নেতার মুখের ভাব এবং বল্লম তুলে ধরার তার ঐ রুদ্ররূপ দেখে স্বর্ণাচারি ভাবল যে তার মৃত্যু নিশ্চিত। গণ্ডক জাতির লোকের প্রাণ হাতে করে অরণ্যপুরের দিকে টেনে ছুটে পালানোর দৃশ্য দেখে স্বর্ণাচারি ভাবল আর তার পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। তার গাছ থেকে নামলেও বিপদ আবার না নামলেও বিপদ।

"গাছ থেকে ঝটপট নামবে না দেব বল্লমটা ছুঁড়ে?" লুণ্ঠনকারীদের নেতা দাঁতে দাঁত ঘষে বলল।

এই হুশিয়ারী পেয়ে স্বর্ণাচারি ভয়ে কাঠ হয়ে পরক্ষণে কাঁপতে কাঁপতে গাছ থেকে আস্তে আস্তে নামতে নামতে বলল, "আমাকে অহেতুক মেরে ফেলে পাপের ভাগী হবেন না। আমি আগেই বলেছি যে আমি একজন শাস্ত্রজ্ঞ। রাজমহল

থেকে শুরু করে কুঁড়ে ঘরের লোক পর্যন্ত আমাকে বাস্তু শাস্ত্রজ্ঞ হিসেবেই চেনে। ছোট বড় সব রকমের বাড়ি নিখুঁত নির্মাণের ব্যাপারে আমি দক্ষ।"

এই কথা লুণ্ঠনকারীদের নেতা শুনে হো হো করে হেসে উঠে বলল, "তোমার কথা মাথমুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। তুমি কি ভেবেছ যে আমি এখানে তোমার খোঁজ করতে এসেছি? আমি মহল বানাতে চাই? মহল বানানোর লোক আমি আর পাইনি? আহম্মক কোথাকার, গাছ থেকে নাম ঝটপট। হুঁ!"

স্বর্ণাচারি চুপচাপ গাছ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। লুণ্ঠনকারীদের নেতা উটের উপর বসেই তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে দেখেতো গণ্ডক জাতির লোকের মত লাগছেনা। তুমি এখানে জঙ্গলে পাহাড়ে কি করছ?"

"মশাই, আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছিনা। আপনি ঠিকই ধরেছেন যে আমি গণ্ডকজাতের লোক নই। আমি পদ্মপুরের অধিবাসী। গৃহনির্মান আমার পেশা, আমি যন্ত্রপাতি বানানোর কলা-কৌশল জানি। ঘরবাড়ি বানানোর কাজ যখন থাকেনা তখন যন্ত্রপাতি বানাই। যন্ত্রপাতি দিয়ে আমি বিশ্বেশ্বর পূজারীর জন্য একটি কৃত্রিম হাতী বানিয়েছি। কিন্তু দুজন ক্ষত্রিয় যুবক আমার রহস্য জেনে নিল। অগত্যা আমাকে নিজের নগর ছেড়ে এই জঙ্গলে চলে আসতে হোল।" স্বর্ণাচারি বলল।

"আরে, তুমি কি নিজেকে এক মহা-পুরুষ ভেবে বসে আছ নাকি? তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার জীবনী জানতে এসেছি? তুমি তোমার জীবনের সব কথা আমাকে বলছ কেন? আমি তো তোমাকে শুধু জিজ্ঞেস করেছি এখানে থাকার কারণ। তুমি এখন যে নগরের নাম করলে সে নগরের লোক আর একজনও কি এখানে আছে?" উট

থেকে নেমে লুণ্ঠনকারীদের নেতা স্বর্ণাচারির বুকে বল্লম ঠেকিয়ে রাখে।

স্বর্ণাচারি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "মশাই, আমাকে মারবেন না। আমি সব বলছি। এখান থেকে অল্প দূরেই দুজন যুবক একটা কুঁড়ে ঘর বানিয়ে বাস করে। তার পাশেই পাথর দিয়ে বানানো বাড়িতে বিশ্বেশ্বর পূজারীর সাথে আমিও থাকি।"

ক্ষত্রিয় যুবকদের কথা শুনে লুণ্ঠন-কারীদের নেতা স্বর্ণাচারির দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, "এখান থেকে অল্প দূরেই ক্ষত্রিয় যুবকরা ঘর বানিয়ে আছে ? ওরা বসে বসে তপস্যা করছে নাতো ?"

"ওরা তপস্যা করবে কোন্ দুঃখে ? ওরা যুদ্ধ সম্পর্কে নিপুণ, জঙ্গলে শিকার খেলা, প্রয়োজন হলে দুষ্টের দমন করা প্রভৃতি ওদের দৈনন্দিন কাজ।" স্বর্ণা-চারি ভীষণ উৎসাহের সাথে একথা বলল।

"ও তাই নাকি ? বলে লুণ্ঠনকারীদের নেতা অট্টহাস্যে বলল, "এখন আমরা যে গণ্ডক জাতির ফসল কেটে নিয়েছি একি দুষ্টদের কাজ হোল ? এই ঘটনার কথা ঐ ক্ষত্রিয় যুবকেরা জানতে পারলে ওরা কি করবে ?"
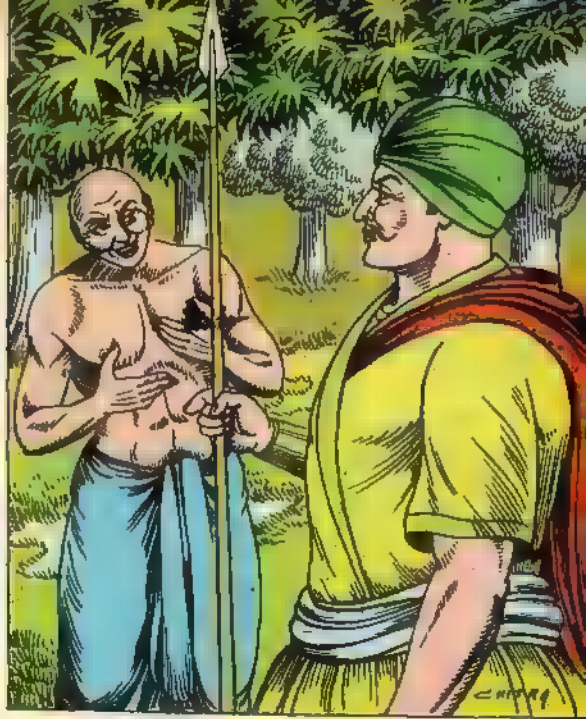
তারপর স্বর্ণাচারি বলল যে লুণ্ঠন করা অবশ্যই দুষ্টদের কাজ আর এই কথা জানার পর ক্ষত্রিয় যুবকেরা নিশ্চয় চুপ করে বসে থাকবে না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল এ ভাবে কথা বলা তো জেনে শুনে বিপদ ডেকে আনা। তাই সে ভাঙ্গা স্বরে বলল, "মশাই, আপনি ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কিত এমন সব জটিল প্রশ্ন করছেন যে কী বলব ভেবে পাচ্ছিনা। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।"

"তুমি বেঁচে গেলে।" লুণ্ঠনকারীদের নেতা বলল। কিছুক্ষণ পরে আবার বলল, "তুমি ক্ষত্রিয় যুবকদের কুঁড়ে ঘরের কথা বলে ছিলে, ওদের ঘর দেখাবে

পক্ষেও ক্ষতিকর। তাই সে ক্ষত্রিয় যুবকদের কুটিরের দিকে এগোতে লাগল। লুণ্ঠনকারীদের নেতা আবার উটে চড়ে বসে নিজের দুই অনুচরকে সাথে যেতে বলল।

আগে আগে স্বর্ণাচারি হাঁটছে আর তার পেছনে তিনজন লুণ্ঠনকারী যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ঐ চারজন এক কুঁড়ে ঘরের কাছে পেঁছোল। ফুল আর ফলে ভরা গাছপালার মাঝে এক সুন্দর পর্ণ-কুটির। ঐ কুটিরের চার দিক বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঐ বেড়ার বাইরে একটি গরু ছিল।

চলতো। এত ভাল লোকের এই জঙ্গলে থাকা আমাদের মত লোকের পক্ষে বিপদজনক।"

স্বর্ণাচারি লুণ্ঠনকারীদের নেতার কথার মানে বুঝতে পারল। ভাবল, এই লোকটা ঐ দুজন ক্ষত্রিয় যুবকদের খতম করতে চাইছে, আমি এখন আগে ভাগে ওদের সাবধান করি কি করে!

"কি ভাবছ! পালানোর চেষ্টা করছ নাকি? সাবধান! তোমার বুকে বল্লম গেঁথে সোজা গাছে ঝুলিয়ে দেব।" লুণ্ঠন-কারীদের নেতা গর্জে উঠল।

স্বর্ণাচারি ভাবল, এখন শুধু কথা বলে কাল ক্ষেপণ করার চেষ্টা জীবনের

লুণ্ঠনকারীদের নেতা ঐ গরুকে দেখেই বলল, "আরে হেই স্বর্ণাচারি, এই গরুকে দেখেতো মনে হচ্ছে এ-বেশ দুধালো গাই। কিন্তু এর বাছুর কোথায়?"

"মশাই, এটা সত্যি দুধালো গাই। বাছুর কুটিরের ওপাশে কোথাও হয়তো চরছে।" স্বর্ণাচারি বলল। এখন তার কাছে একমাত্র ভাবনা, কেমন করে আগে ভাগে শত্রুর আগমনের কথা ক্ষত্রিয় যুবকদের জানাবে। কিন্তু লুণ্ঠনকারী গাই বাছুরের প্রশ্ন করে কথায় আটকে রাখছে।

"মশাই, আপনারা এখানেই দাঁড়ান। আমি দেখে আসছি ঐ ক্ষত্রির যুবকরা

ঘরে আছে কিনা।" স্বর্ণাচারি যেন নিজের বোকামীর পরিচয় দিয়ে বলল।

এই কথা শুনে লুণ্ঠনকারীদের নেতা হেসে বলল, "তোমার এসব চালাকি আমার কাছে চলবে না। সিন্ধুর রেগিস্তান থেকে শুরু করে এখানকার এই জঙ্গল এবং পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছানোর পথে তোমার মত অনেককে দেখেছি। তুমি এই বেড়ার কাছে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে বল যে আত্মীয় এসেছে। বুঝলে? চিৎকার করে ডাক দাও।"

লুণ্ঠনকারীদের নেতার চাল বুঝতে পারল স্বর্ণাচারি। আত্মীয় এসেছে বলে চিৎকার করলে ক্ষত্রিয় যুবকদ্বয় বিনা অস্ত্রে বাইরে আসবে। তখন ওদের হত্যা করা সহজ হবে। এই কথা ভেবেই হয়তো লুণ্ঠতকারীদের নেতা ওভাবে ডাকতে বলছে। ঐ নেতা যেভাবে বলছে সেভাবে না ডাকলে আবার প্রাণহানি হতে পারে। কি করা যায়?

"হুঁ! এত দেরি করছ কেন? যেভাবে ডাকতে বলছি সেভাবে ডাক।" এ কথা বলে লুণ্ঠনকারী নেতা স্বর্ণাচারির পিঠে বল্লম ঠেকিয়ে দিল।

স্বর্ণাচারি উচ্চ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, "উটের পিঠে চড়ে দূর দেশ থেকে আত্মীয় এসেছেন।" স্বর্ণাচারি এই কথা

বলে দু'তিনবার ডাক দিলেও ঐ কুটির থেকে কেউ বেরুল না।

তখন স্বর্ণাচারি ভাবল, বিপদ তাহলে কেটে গেছে। বলল, "আমার তো মশাই মনে হচ্ছে, এই ক্ষত্রিয় যুবকরা শিকার করতে বাইরে গেছে।"

"সন্দেহ যখন আছে আর একবার ডাক।" ঐ নেতা বলল।

স্বর্ণাচারি এবার আরও জোরে চিৎ-কার করে ডাক দিল। কিন্তু কুটির থেকে কেউ বাইরে বেরিয়ে এলো না। তখন লুণ্ঠনকারীদের নেতা নিজের এক অনু-চরকে আদেশ দিল, উটে বসেই স্বর্ণাচারির উপর নজর রাখতে। সে যেন পালিয়ে

এক কোণে দুটো বল্লম এবং তীর-ধনুক ছিল।

"এরা দুজনে ভাল তীর চালক মনে হচ্ছে। দূর থেকে শত্রু অথবা জানোয়ার হত্যার পক্ষে তীরের মত জিনিস আর নেই। তীর-ধনুক চালানো আমাদেরও তাড়াতাড়ি শিখে নিতে হবে। তুমি ঐ তীর-ধনুক নিয়ে নাও।" লুণ্ঠন-নেতা নিজের অনুচরকে নির্দেশ দিল।

নিজের নেতার নির্দেশ পেয়ে অনুচর এগিয়ে গিয়ে তীর-ধনুক তুলে কাঁধে রাখল। লুণ্ঠন-নেতা মনযোগ দিয়ে কুটিরের আনাচে কানাচে ভাল করে দেখল কিন্তু কোন দামী জিনিস না পাওয়ায় নিরাশ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

না যায়। তারপর অন্য অনুচরকে নিয়ে নিজে বেড়ার ভেতরে ঢুকে কুটিরের কাছে গেল।

কুটিরের দরজা ঝাঁপ ফেলে বন্ধ করা আছে। দরজা বন্ধ দেখে লুণ্ঠনকারীদের নেতা নিজের অনুচরকে বলল, "স্বর্ণাচারির কথা সত্য। ক্ষত্রিয় যুবক দুজন কুটিরের ভেতর নেই। ভেতরে গিয়ে দেখে আসি। কোন দামী জিনিস পেয়ে যেতে পারি।"

তারপর ওরা দুজনে ঝাঁপ সরিয়ে কুটিরের ভেতরে ঢুকল। কোন দামী জিনিস তাদের হাতে পড়ল না। দরজার কাছে বাঘ, ভালুক, হরিণ প্রভৃতির চামড়া দেওয়ালের সাথে ঝোলানো ছিল। কুটিরের

"স্বর্ণাচারি, ক্ষত্রিয় যুবকরা দেখছি কুটিরে খাবার তো দূরের কথা তরি-তরকারীও রাখেনি। বাঘ এবং হরিণের চামড়া বাদে হাতীর দাঁতও নেই। ওরা কি জঙ্গলী হাতীর শিকার করেনা?" লুণ্ঠন-নেতা জিজ্ঞেস করল।

"এই ক্ষত্রিয় যুবকেরা শুধু খাওয়ার জিনিস বাদে অন্য কোন জঙ্গলী জানো-য়ার শিকার করেনা। আপনারা যে বাঘের চামড়া দেখেছেন সেই বাঘকেও নিতান্তই আত্মরক্ষার্থে মেরেছিল।" স্বর্ণা-

চারি বুঝিয়ে বলল।

"ওহো তাই নাকি! তাহলে তো এরা হাতীর দাঁতের দামও জানেনা।" লুণ্ঠন-নেতা ব্যঙ্গ করে যেন বলল।

এরপর লুণ্ঠন-নেতা অনুচরটিকে ইশারায় গরুটিকে দেখিয়ে বলল, "উটের দুধ খেতে খেতে মুখ ফিরে গেছে। ঐ গাইটাকে দড়ি বেঁধে টেনে আন। কিন্তু ওর বাছুর কোথায়?" চারদিকে তাকাতে তাকাতে লুণ্ঠন-নেতা বলল।

অনুচরটি গরুর গলায় দড়ি বেঁধে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল উটের কাছে। গরুও বাঁধন ছেঁড়ার জন্য টান মারতে মারতে আম্বা আম্বা ডাকছিল। ঐ ডাক শুনেই কুটিরের পেছন থেকে বাছুর ছুটে এলো।

"বা! আমি যা ভেবেছি তাই হোল। এখন এই স্বর্ণাচারিকে উটের উপর বসাও।" লুণ্ঠন-নেতা বলল।

এই কথা কানে যেতেই স্বর্ণাচারি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "মশাই, আমাকে আপনারা নিয়ে যাবেন না। আমি এখানে ভালই আছি। আমার বাকি জীবনটা এখানেই কাটাতে দিন।"

"ওসব চলবেনা। আমরা যেখানে থাকি ওখানে তোমাকে ভাল ভাল ঘর-

বাড়ি বানাতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা এই দেশের চারশো ক্রোশ দখল করে আমাদের শাসন চালাতে চাই। এখন যেখানে মহল বানাতে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই স্থান হবে আমাদের রাজধানী। আমরা চাই তোমাকে আমাদের দরবারের বাস্তুশাস্ত্রী বানিয়ে সম্মানিত করতে।" লুণ্ঠন-নেতা যেন সব বুঝিয়ে বলল।

"মশাই, আমি এই ধরনের কোন পদ চাইনা। আমি এখানে বেশ আছি..."

স্বর্ণাচারির কথা শেষ হতে-না-হতেই লুণ্ঠনকারী তার ঘাড় ধরে উটের উপর বসিয়ে দেয়। স্বর্ণাচারি অগত্যা আর্তনাদ

করে ওঠে, "শত্রুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। রক্ষা কর।"

কুটিরের দিকে যেতে যেতে বিঘ্নেশ্বর পূজারী নিজের মিত্র স্বর্ণাচারির আর্তনাদ শুনে ভাবল স্বর্ণাচারি বোধ হয় কোন বিপদে পড়েছে। এসব ভেবে পূজারী তাড়াতাড়ি কুটিরের দিকে এগোল। বিঘ্নেশ্বর দেখল স্বর্ণাচারিকে উটের পিঠে বসানো হয়েছে আর গরুকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিঘ্নেশ্বর পূজারীর মনে হঠাৎ এক বুদ্ধি জাগল। ক্ষত্রিয় যুবকরা একটি সিংহ শাবককে বাচ্চা বয়সে এনে পুষেছিল। ক্ষত্রিয় যুবকরা যখন কুটিরে থাকে তখন সেই সিংহ-শাবক ছাড়া থাকে। শাবকটি আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যুবকেরা যখন কুটিরে থাকেনা তখন ওরা ঐ সিংহ-শাবকটিকে কুটিরের পেছন দিকে বাঁশের খাঁচায় রেখে দিয়ে যায়।

এখন বিঘ্নেশ্বর পূজারীর মনে হোল, সিংহ-শাবককে ছেড়ে দিলে হয়তো স্বর্ণাচারি এবং গরু ছাড়া পাবে। গরু এবং সিংহ-শাবকের মধ্যে ভাল ভাব ছিল। গরুর আম্বা রব সিংহ-শাবককে আরও উত্তেজিত করতে পারে। ফলে লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে তাকে লেলিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

বিঘ্নেশ্বর পূজারী ছুটে গিয়ে কুটিরের পেছনের বাঁশের খাঁচা থেকে সিংহ-শাবককে মুক্ত করে দিল। খাঁচার বাইরে বেরিয়েই সিংহ-শাবক লুণ্ঠনকারীদের দিকে ধাবিত হোল। তাকে দেখেই উট ঘাবড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। লুণ্ঠনকারী থতমত খেয়ে হঠাৎ পড়ে গেল নিচে। সিংহ-শাবক একলাফে ঐ লুণ্ঠনকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরল।

(চলবে)

অন্যায় শাস্তি

নাছোড়বান্দা রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ গাছের কাছে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতই নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটা দিলেন। তখন শব থেকে বেতাল বলল, "মহারাজ আপনি কোন অপরাধ না করে এই ভাবে কষ্ট করছেন ; এই জগতে কোন আক্রমণ করেনি এমন লোককেও আক্রান্ত হতে হয় এক একবার। উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে যজ্ঞ সুন্দরের কাহিনী বলছি। বিরক্ত না হয়ে শুনুন। বেতাল শুরু করল :

যজ্ঞস্থল নামে এক গ্রামে যজ্ঞ সুন্দর নামে এক ধনী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ওঁর হরিসুন্দর এবং দেবসুন্দর নামে দুই ছেলে ছিল। ঐ ছেলেদের কৈশোর পেরোতে-না-পেরোতেই যজ্ঞ সুন্দরের সমস্ত অর্থ খরচ হয়ে গেল। তারপর
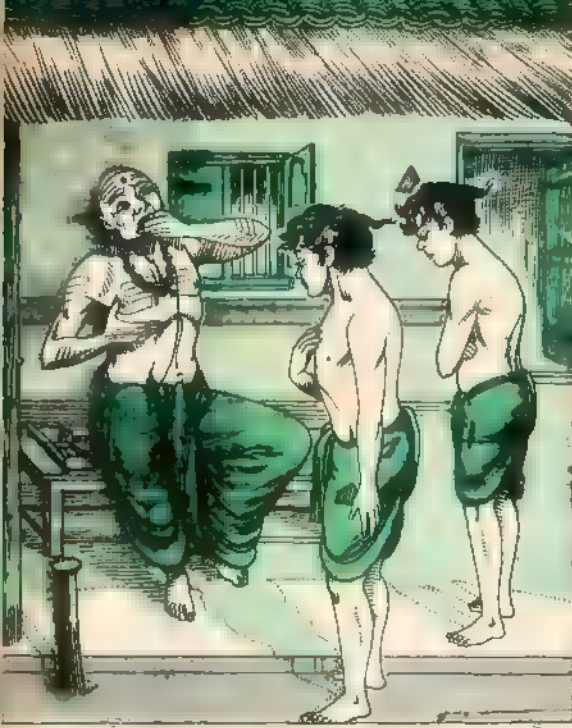
তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। এবং পরে তিনিও মারা গেলেন।

এইভাবে যজ্ঞসুন্দরের ছেলেরা অভি-শপ্ত জীবন পেল। অনাথ হয়ে গেল। তাদের আত্মীয় স্বজনরা তাদের এড়িয়ে যেতে লাগল। অবশেষে ভিক্ষে করা ছাড়া ওদের সামনে আর অন্য কোন পথ খোলা ছিল না।

ওদের মামার বাড়ি অনেক দূরে। তা সত্ত্বেও নিজেদের গ্রামে থাকতে না পেরে ওরা মামার-বাড়ির গ্রামের দিকে রওনা দিল। অনেক পথ। পথে ভিক্ষে করতে করতে তারা এগোতে লাগল। ঐ গ্রামে পা রেখেই জানতে পারল যে ওদের দাদু-দিদিমা মারা গেছেন। তবু, তাদের মামারা যজ্ঞদেব এবং ক্রতুদেব তাদের যথেষ্ট আদর যত্নে রেখে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যে ওদের অবস্থাও পড়ে যেতে লাগল। ওরা ভাগ্নেদের বলল, "ওরে ভাগ্নেরা, গরু ছাগল চরাতে যে লোক রেখেছিলাম তাদেরও আর পুষতে পারছিনা। এক কাজ কর, তোমরাই চরাও।

দুঃখে বাচ্চাদের গলা ধরে এলো। অন্য কোন উপায় না থাকায় তাতেই ওরা রাজী হয়ে গেল। প্রত্যেক দিন গরু ছাগল চরাতে নিয়ে যেত আর সন্ধ্যের সময় নিয়ে ফিরত। এইভাবে ওদের দিন কাটছিল। একদিন একটা গরু বাঘে নিয়ে গেল। আর একদিন এক ছাগল চোরে নিয়ে পালাল। অবস্থা যখন খারাপ তখন গরু ছাগল হারিয়ে মামারা ভাগ্নেদের উপর চটেছিল এমন সময় আরও মারাত্মক কাণ্ড ঘটে গেল। মামারা যে গরু এবং পাঁঠাকে যজ্ঞের কাজের জন্য রেখেছিল, একদিন ঐ দুটোই হারিয়ে গেল।

এটা লক্ষ্য করে ভাগ্নেরা আর কাল বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ বাকি গরু ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরে ওদের যথা-

স্থানে রেখে ঐ দুটোকে খুঁজতে বেরুলো। বনে অনেক দূর যাওয়ার পর ওদের নজর পড়ল ঐ পাঁঠার একটা অংশের উপর। ঐ পাঁঠাটার অর্দ্ধেক বাঘে ফেলে গেছে।

"এটা আমাদের মামাদের যজ্ঞের পাঁঠা। এটাও বাঘের পেটে গেছে জানতে পারলে মামারা তেলে বেগুনে চটে যাবে। এটাকে পুড়িয়ে যতটা পারা যায় খেয়ে নিয়ে বাকিটা নিয়ে কোথাও চলে যাওয়া ভাল। দুই ভাই ওখানেই আগুন ধরিয়ে বাঘের ফেলে যাওয়া পাঁঠাটার অংশকে পোড়াতে লাগল।

ইতিমধ্যে ভরা দুপুরে গরু ছাগলের ঘরে ফেরা দেখে মামারা ভাগ্নেদের উপর ভীষণ চটে গেল। ওদের খোঁজে বেরিয়ে বনে এসে দেখে বলল, "যজ্ঞের জন্য রাখা পাঁঠাটাকে মেরে খাচ্ছিস! তোরা ব্রহ্ম-রাক্ষস হয়ে যা!" বলে অভিশাপ দিল মামারা।

মামাদের অতদূর থেকে দেখতে পেয়েই দুই ভাই টেনে ছুটতে লাগল। ওরা ছুটতে ছুটতেই অভিশপ্ত হোল। ব্রহ্ম-রাক্ষসে রূপান্তরিত হোল।

ওরা বনে বাদাড়ে ব্রহ্ম-রাক্ষস হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একবার এক যোগীকে ওরা খেতে গেল। সেই যোগীর

অভিশাপে ওরা পিশাচ হোল।

ওরা পিচাশ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। এমন সময় একদিন ওরা এক ব্রাহ্মণের গরু পোড়ানোর চেষ্টা করল। তখন ঐ ব্রাহ্মণ ওদের চণ্ডাল হওয়ার অভিশাপ দিল। তারপর, ওরা বল্লম আর তীর ধনুক নিয়ে চণ্ডালদের মত ঘুরতে ঘুরতে ক্ষুধার জ্বালায় ছটপট করতে করতে অব-শেষে এক ডাকাতদের গ্রামে পৌঁছে গেল। পাহারায় যারা ছিল তারা ঐ দুই ভাইকে ধরে মেরে বেঁধে নিয়ে গেল তাদের নেতাদের কাছে।

ডাকাতদের নেতা ওদের কথা শুনে ওদের বাঁধন খোলার হুকুম দিল। ওদের

খাইয়ে বলল, "তোমরাও আমাদের সঙ্গে থাক। তোমাদের কোন ভয় নেই।" বলে ওদের প্রতি সমবেদনা জানাল।

তারপর থেকে ঐ দুই ভাই, হরি সুন্দর এবং দেব সুন্দর ডাকাতদের সাথে থেকে চুরি ডাকাতি করে নিজেদের যোগ্যতা-বলে একদিন ডাকাতদের নেতা হয়ে গেল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "মহারাজ, যজ্ঞ সুন্দরের দুই ছেলে কোন অপরাধ না করে এত বিপদে পড়ার কারণ কি? সারা জগতের লোক ওদের খারাপ চোখে দেখলেও ডাকাতরা ওদের সাদরে বরণ করে নিল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দেন আপনার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।" বলল বেতাল।

তার জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, "সামাজিক ধর্মবোধের মধ্যে স্বার্থ আছে। ঐ স্বার্থ বুদ্ধিই যেখানে আসন গেঁড়ে বসে থাকে সেখানে মানুষ স্বার্থ বুদ্ধি দিয়েই সব কিছুর বিচার করে। স্বার্থ-বাদীরা নিজেদের স্বার্থের কথাই বেশি করে ভাবে। যজ্ঞ সুন্দরের ছেলেদের কপালে যে এত দুঃখ কষ্ট জুটল তার মূল কারণও তাই। মামারা যে ভাগ্নেদের ভালবাসতো না তা নয় কিন্তু তাদের স্বার্থ হানি হওয়ার সাথে সাথে ওরা ভাগ্নেদের উপর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। অভিশাপ দিল। দুই ভাই ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে গেল। যোগী ওদের পিশাচ, আর ব্রাহ্মণ ওদের চণ্ডাল হতে যে অভিশাপ দিল তা ওদের শাপে বর হোল। ব্রহ্ম-রাক্ষসের চেয়ে পিশাচ ভাল, পিশাচের চেয়ে চণ্ডাল ভাল। এরপর আসে ডাকাতদের কথা। ওরা একসাথে থাকে। ওদের মধ্যে একজনের স্বার্থের কোন ব্যাপার নেই। দলের স্বার্থই বড়। যজ্ঞ সুন্দরের ছেলেরা চোর ডাকাতদের সাথে চুরি ডাকাতি করে সুখেই ছিল।" বললেন বিক্রমাদিত্য।

রাজা উত্তর দিতেই বেতাল শব নিয়ে পালিয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

রাজার জ্ঞাতি

এক হাজার বছর আগের কথা। বঙ্গদেশে এক বড় বিবেকবান ধর্মাত্মা রাজা শাসন করছিল। তার কাছে অনেক ধন সম্পত্তি ছিল। রাজা দিল-দরিয়া হয়ে দুহাতে দান করত।

একদিন দরবার বসেছে। এক গরীব বৃদ্ধ দরবারের দরজায় এসে প্রহরীর কাছে রাজার দর্শনের অনুমতি চায়।

"তুমি কে? কোন্ কাজে এসেছ রাজার কাছে?" প্রহরী বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল।

"আমি রাজার জ্ঞাতি। রাজার সাথে আমার জরুরী কথা আছে।" বৃদ্ধ জবাবে বলল।

প্রহরী এই সংবাদ রাজাকে জানাল। রাজা বৃদ্ধকে দরবারে ঢোকার অনুমতি দিল। রাজার জ্ঞাতিকে দেখার জন্য দরবারের সবাই উৎসুক হয়ে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ দরবারে প্রবেশ করল। ঝুঁকে রাজাকে নমস্কার করল। বৃদ্ধের হাতে একটা লাঠি ছিল। তার পোষাক ছিল ছেঁড়া এবং নোংরা।

"তুমি কে?" রাজা জিজ্ঞেস করল।

"মহারাজ আমি আপনার বড় মাসির ছেলে। এই সম্পর্কে আমি আপনার জ্ঞাতি।" জবাব দিল বৃদ্ধ।

রাজা হেসে জিজ্ঞেস করল, "হে আমার বড় ভাই, কুশলে আছো তো?"

"কুশলের কথা আর কি বলব মহা-রাজ? আমার জীবন একেবারে এলো-মেলো হয়ে গেছে। আমার সুন্দর ঘর হেলে দুলে গেছে। আমার বত্রিশ জন লোক, যারা আমার সেবা করত, তারা সব এক এক করে বেরিয়ে গেছে। যে কাজ আগে দুজনে করে ফেলত, এখন ঐ দুটির কাজ তিন জনে করছে।

রত্না ভদ্র

আমার কাছের দুই মিত্র দূরে সরে গেছে। যে দুই মিত্র দূরে ছিল তারা কাছে এসে গেছে।" বৃদ্ধ বলল।

"তাহলে তুমি আমার কাছে এলে কেন?" রাজা জিজ্ঞেস করল।

"মহারাজ আমার শেষ জীবন আরামে কাটাতে হলে আপনার সাহায্য নিতেই হবে।" বৃদ্ধ উত্তর দিল।

রাজা বুড়োর হাতে এক টাকা দিল। এতে বৃদ্ধ নিরাশ কণ্ঠে বলল, "মহারাজ, এ আপনি কি দিলেন? আমি ভেবে-ছিলাম কম করে এক হাজার টাকা পাব। আপনার দানশীলতার এত খ্যাতি, এত প্রশংসা!"

"আরে ভাই আজ খাজানা খালি হয়ে গেছে।" রাজা বলল।

"খাজানা খালি হয়ে গেলে লঙ্কায় যাচ্ছেন না কেন? ওখানে অগাধ সোনা পড়ে আছে।" বুড়ো বলল।

"লঙ্কায় পৌঁছাতে হলে তো সমুদ্র পার হতে হবে। আমি কি করে পার হব?" রাজা জিজ্ঞেস করল।

"এ আর এমন কি সমস্যা। প্রথমে আমাকে লঙ্কায় পাঠিয়ে দেবেন তারপর আপনি পায়ে হেঁটেই লঙ্কায় যেতে পারবেন।" বুড়ো বলল।

রাজা হো হো করে হেসে উঠে খাজানা থেকে এক লক্ষ টাকা আনিয়ে বৃদ্ধকে দিয়ে দিল। বুড়ো বিদায় নিল।

এরপর দরবারে কানাঘুষা শুরু হয়ে
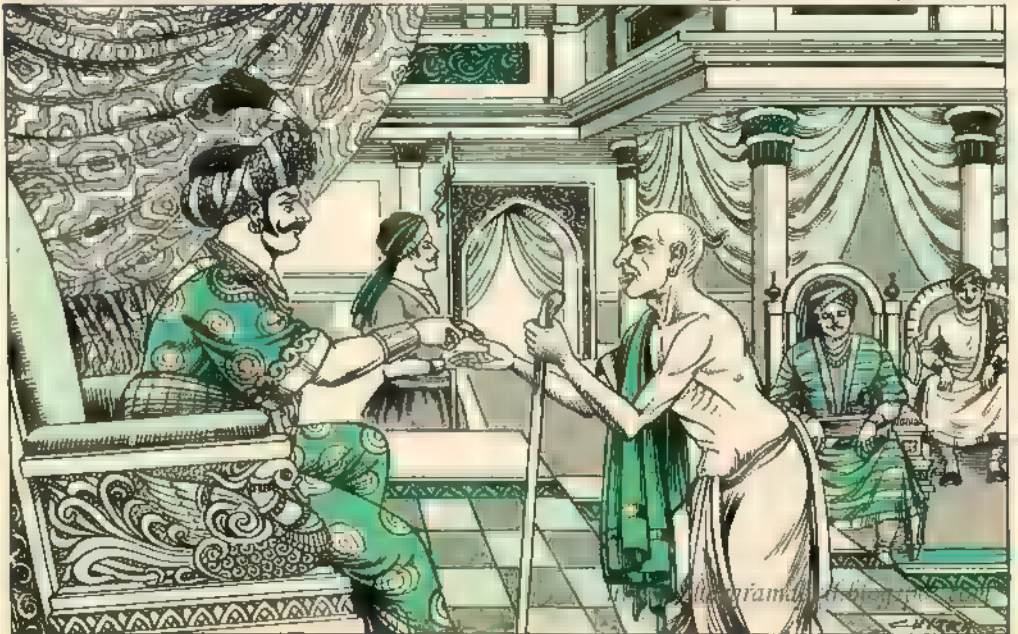
গেল। রাজা এবং বৃদ্ধের মধ্যে যে কথা-বার্তা হোল দরবারের কেউ তার অর্থ বুঝতে পারেনি। এই ব্যাপার অনুমান করে রাজা সবাইকে বুঝিয়ে বলল :

"আমার ধারণা বৃদ্ধের কথা সবার কাছে পরিষ্কার হয়নি। উনি আমার জ্ঞাতি বললেন। আমার বড় মাসির ছেলে। সবাই জানে দারিদ্র দেবী আর লক্ষ্মী দেবী দুই বোন। বৃদ্ধ জানাতে চাইল যে আমি লক্ষ্মীপুত্র আর বুড়ো হোল লক্ষ্মীর বড় বোন দারিদ্র দেবীর পুত্র। এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই আমরা দুজন জ্ঞাতি। ওর নড়বড়ে ঘর হোল ওর শরীর। ওর বত্রিশটি সেবক হোল ওর বত্রিশটা দাঁত। ঐ দাঁতগুলো পড়ে গেছে। বাইরের কাজ করতে আগে যেখানে দুটির প্রয়োজন হোত আজকাল তিনটি লাগে। তার মানে আগে দুপায়ে চলতো আর আজকাল সেখানে দরকার পড়ছে একটি লাঠির। আগে দুই মিত্র দূরে ছিল এখন তারা কাছে এসে গেছে। ঐ দুই মিত্র হোল তার চোখ। আর আগে যে দুই মিত্র কাছে ছিল তারা এখন দূরে সরে গেছে। এই দুই মিত্র হোল কান। অর্থাৎ সে চোখে ভাল দেখেনা, কানে ভাল শোনেনা। এই সব কথার চেয়ে সে আর একটা চমৎকার কথা বলল। তা হোল আমি তাকে লঙ্কায় পাঠিয়ে দিলে সমুদ্র শুকিয়ে যাবে। তার পেছনে আমি পায়ে হেঁটে যেতে পারব। আমি যখন বললাম যে খাজানা খালি হয়ে গেছে তখনই আমার কথার পিঠে বুড়ো লঙ্কার কথা বলল। এই কথার মানে হোল সে যেহেতু দারিদ্র দেবীর পুত্র, সে যেহেতু আমার ঘরে এসেছে সেই হেতু খাজানা খালি হয়ে গেছে। তাকে দেবার কিছুই বাকি নেই। শুধু এই একটি মাত্র কথার জন্য আমি তাকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দিলাম।"

এরপর দরবারের সবাই বুড়োর চাতুর্যপূর্ণ কথা এবং রাজার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হোল।

প্রভেদ নেই

কোন এক গ্রামে এক লক্ষপতি বাস করত। লোকটা হাড় কেপ্পণ।

এক ভিখিরী নানান জায়গায় ঘুরে ঐ ধনীর বাড়িতে এলো। ধনী লোকটা দালানে বসে ছিল।

"বাবু একটু ভিক্ষে দিন।" ভিখিরী বলল।

"নেই, যা এখান থেকে।" বলল ধনী।

"ছেঁড়া কাপড় একটা থাকলে দিন বাবু।" ভিখিরী বলল।

"নেই, যা এখান থেকে।" বলল লক্ষপতি।

"কিছু খেতে দিন বাবু।" বলল ভিখিরী।

"নেই, যা এখান থেকে।" বলল ধনী বপুধারী।

"যাক্‌গে, একটা বিড়ি দিন বাবু।" নাছোড়বান্দা ভিখিরী বলল।

ছড়িধারী ধনী ব্যক্তি রাগে গজ গজ করতে করতে বলল, "নেই, যেতে বলছিনা। কানে যায়নি আমার কথা ? উঁ!"

"বাবু, তাহলে আপনার আর আমার অবস্থা একই। চলে আসুন আমার সাথে। দুজনে মিলে ভিক্ষে করব।" বলল ভিখিরী।

—বি. রাণা

দুজন ভিখারী

দক্ষিণের এক গ্রামে রাঘব ও শঙ্কর নামে দুই বন্ধু ছিল। রাঘব ছিল বৈষ্ণব এবং শঙ্কর ছিল শৈব। দুজনেই একসাথে ভিক্ষে করতে বেরুতো। যেখানে ভিক্ষে করতে করতে রাত হয়ে যেত সেখানেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ত।

রাঘব ভিক্ষে করতে যে দিকে গেল সে দিকের একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলল, "মাগো, মা, ভিক্ষে দিন মা।"

ঐ ঘরের গৃহিণী নিজের বাচ্চা মেয়ের কান্না থামাতে না পেরে সে চিৎকার করে বলে উঠল, "ফের যদি বিরক্ত করিস তো দেখবি। দিয়ে দেব ঐ বৈষ্ণব ভিখারীকে।" এরপর ঐ গৃহিণী ভিক্ষে দিয়ে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু ভিখারী দরজার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে বলল, "মাগো, তোমার মেয়েকে যে দেব বললে, দাও।" বলে দোর গোড়ায় বসে পড়ল। গৃহিণী ভিখারীর কথায় চটে গিয়ে বলল, "মেয়েকে দিতে হবে? দিচ্ছি, কর্তা ক্ষেত থেকে ফিরুক। ওঁকে না জিজ্ঞেস করে মেয়েটাকে তোমাকে দিই কি করে বল।"

রাঘব ঠায় বসে রইল সেখানে।

"আমাদের মেয়েটা কাঁদছিল। হঠাৎ বললাম, কাঁদলে দিয়ে দেব ঐ ভিখারীকে। সে কথা শুনে লোকটা ঠায় বসে আছে।" গৃহিণী তার স্বামীকে বলল।

ক্ষেত থেকে খেটে খুটে এসে বউএর কথা শুনে ওর ভীষণ রাগ ধরল ভিখারীর উপর। হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে রাঘবকে ঠেঙ্গিয়ে তাড়িয়ে দিল। মনে মনে রাঘব ঠিক করল শঙ্করকেও মার খাওয়াবে।

রাঘব মার খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে ঐ আশ্রমে ফিরে এলে শৈব শঙ্কর বলল,

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

"কি হে রাঘব, তোমার এত দেরি হোল কেন ? কি ব্যাপার ?"

ওপাড়ার চৌধুরীদের বাড়িতে আজ মেয়ের জন্মদিন পালন করছে। বাবা, এই মাগ্গি-গণ্ডার দিনে কি খরচ করল! ভিখারীদের এত মাংস, পায়েস, দই, রসগোল্লা খাওয়াতে আমার বাপের জন্মে দেখিনি। তা পেলুম যখন ধীরে ধীরে বসে বসে খেলুম। আবার ভাবলাম কি জানি, ঘুরতে ঘুরতে যদি তুমিও চলে আস, তাহলে এক সাথেই ফিরব। কিন্তু তুমি তো আর গেলে না।" রাঘব বলল।

মাংস পায়েস দই রসগোল্লার কথা শুনে শঙ্কর চৌধুরীদের বাড়ি যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। তাড়াতাড়ি হাঁটা দিল ঐ পাড়ার দিকে। চৌধুরীদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "বাবু, আজ আপনার মেয়ে—"

"পাজী, নচ্ছার তোকে এত পিঠলাম তাতেও তোর জ্ঞান হোলনা!" বলে ঐ বাড়ির কর্তা একটা লাঠি নিয়ে মেরে তাড়াল।

শঙ্কর আস্তনায় ফিরে এসে রাঘবকে কিচ্ছু বলল না। রাঘবও শঙ্করের সাথে খাওয়ার ব্যাপারে কোন কথা বলল না। কিন্তু শঙ্কর মনে মনে ঠিক করে নিল রাঘবের এই অপরাধের বদলা নেবে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। শঙ্কর বলল, "বুঝলে রাঘব,
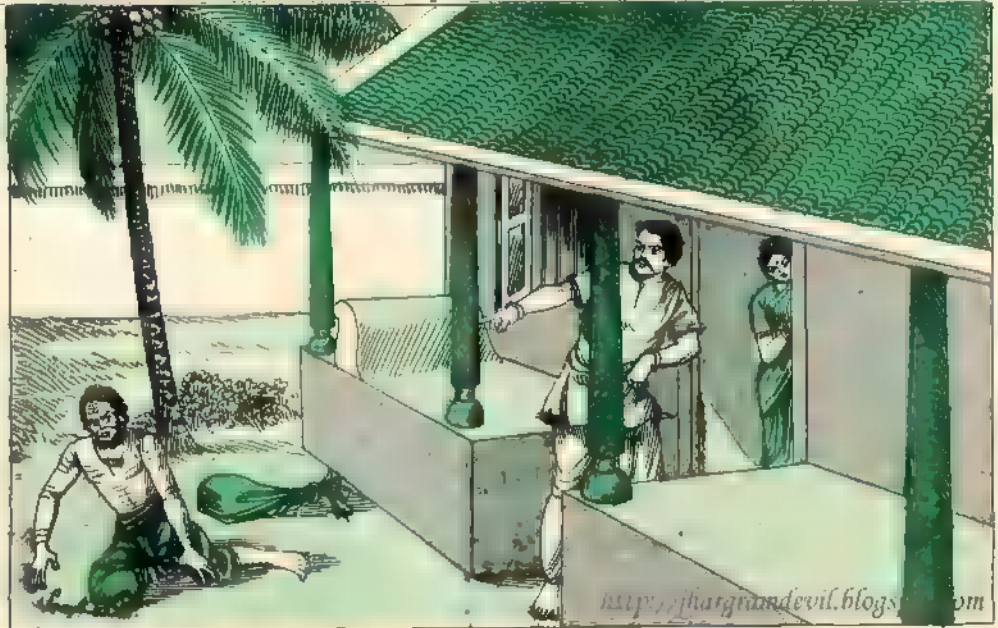
আমি তো শৈব। তোমার কপালের তিলক উপর নিচে কাটা। সোজাসুজি টানা। আমি যেহেতু শৈব, আমার কপালের বিভূতিরেখা আড়াআড়ি টানা। এই আশ্রমের চালের দিকে তাকাও। সোজাসুজি কাঠের উপরে আড়াআড়ি কাঠগুলো আছে। অতএব তোমার উপরে আমার স্থান।"

"তা হতেই পারে না। এ অসহ্য।" বলে, রাঘব চালে উঠে আড়াআড়ি যত কাঠ ছিল সব টেনে তুলে ফেলে দিল নিচে। তারপর শঙ্করও চালে উঠে সোজাসুজি যে কাঠগুলো ছিল সেগুলো টেনে তুলে নিচে ফেলে দিল।

কিছুক্ষণ পর শঙ্কর রাঘবকে বলল, "আমরা দুজনে তো চালের সব কাঠ তুলে ফেলে দিয়েছি। সকালে গাঁয়ের লোক, কে ফেলেছে জিজ্ঞেস করলে তুমি মুখে কিছু বলবে না। আমার কপালের বিভূতি রেখা আড়আড়ি আছে তাই আমি মাথাটাকে আড়াআড়ি নাড়ব। আর তোমার কপালের তিলক রেখা উপর নিচে সোজাসুজি কাটা আছে, তাই তুমি মাথাটাকে উপর নিচে নাড়বে।"

রাঘব বুঝতেই পারল না যে উপর নিচে মাথা নাড়লে 'হ্যাঁ' হয়, আর আড়াআড়ি মাথা নাড়লে 'না' হয়। সকালে গাঁয়ের লোক এসে জিজ্ঞেস করল, "কে এসব কাঠ তুলে ফেলেছে।" তৎক্ষণাৎ শঙ্কর আড়াআড়ি মাথা নাড়ল। আর রাঘব উপর নিচে মাথা নাড়ল। গাঁয়ের পাঁচজন বুঝলো যে এ অপকর্ম রাঘবেরই। সেই সব কাঠ তুলে ফেলেছে। তাই ওরা রাঘবকে ভীষণ মারল।

"একি করলে বল দিকি? আমাকে শেষে মার খাওয়ালে?" রাঘব বলল।

"আর তুমি যখন আমাকে চৌধুরী-দের বাড়িতে মার খাওয়াতে পাঠালে তখন কেমন লাগছিল? তাই বলি আর কোন দিন অমন কাজ করোনা।" শঙ্কর বলল।

পাগলী

এক গ্রামে এক গেরস্থের একটি মেয়ে ছিল। তার মাথার একটু গোলমাল ছিল। সব সময় বক বক করত সে। মেয়েটির এই অতিরিক্ত বকার জন্য কোন পাত্র জুটছিল না। ওর বাবা-মা কত করে বোঝাত কেউ দেখতে এলে যেন চুপ চাপ থাকে। কত বোঝাত। কিন্তু কোন ফল হোতনা।

একদিন এক পাত্রপক্ষের মেয়েকে দেখতে আসার কথা ছিল। পাত্রও থাকবে তাদের মধ্যে। মেয়ের মা মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে বুঝিয়ে বলল, "মা, এই সাজা পান তোর কাছে রাখ। পাত্র বাড়ির ত্রিসীমানায় আসার সাথে সাথে এই পান মুখে পুরে নিবি। ওরা বসলে পান চিবোবি। ওরা চলে গেলে মুখের পান থু-থু করে ফেলে দিবি।"

কিছুক্ষণ পরে মেয়ে দেখতে লোকজন সহ পাত্র এলো। ওদের বাড়ির ত্রিসীমানায় পা রাখতেই মেয়ে চিৎকার করে মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, এইবার মুখে পুরে নেব?"

ঐ কথা কানে যেতেই পাত্র তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বসে পড়ল।

"মা, এখন বসেছে। চিবাবো?" মেয়ে উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

চিবানোর কথা শুনে পাত্র এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঐ বাড়ি থেকে। তার পেছনে অন্যেরাও ছুটে পালাল।

"বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেছে, থু থু ফেলব?" আবার পাগলী মেয়েটা চিৎকার করে উঠল।

পাত্র আর পেছনের দিকে তাকায়নি। ছুটছে তো ছুটছেই। —শম্পা দাসগুপ্তা
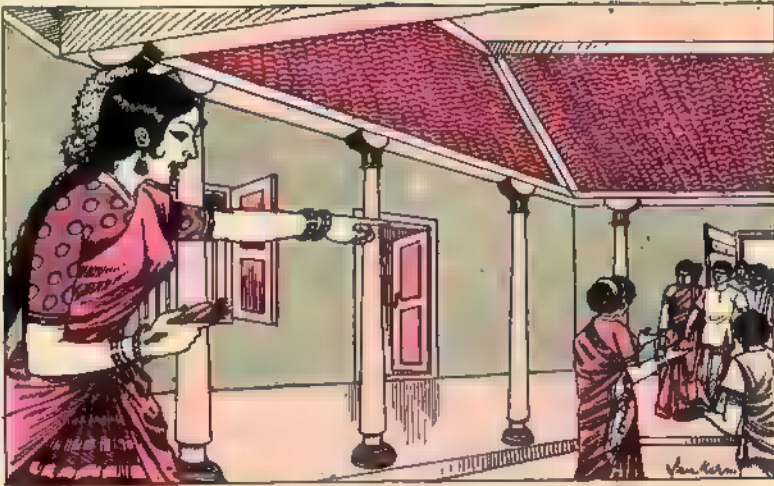
ক্ষতি করতে গিয়ে

এক দেশে এক বুড়ো ছিল। তার ছিল দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম প্রাণেশ্বর আর ছোটর নাম কনকেশ্বর। ওদের বিষয়-সম্পত্তি বলতে তেমন কিছু ছিল না। বাড়ি, কয়েকটি মুরগী ও একটি কুকুর।

মৃত্যুর আগে বুড়ো দুই ছেলেকে ডেকে বলল, "বাছা ধনেরা, আমার মারা যাওয়ার পর তোমরা বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া না করে আপোষে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে সুখে দিন যাপন কর। কেউ কাউকে ঠকিয়ো না।" বুড়ো ছেলেদের উপদেশ দিল। দুই ছেলে বাবার কথা মতো চলার কথা দিল।

বাবার মারা যাবার পর তারা ঘর-বাড়ি সব ভাগ করে নিল।

বড় ছেলে প্রাণেশ্বরের নজর পড়ল মুরগীগুলোর উপর। কুকুর পোষা বৃথা। মুরগী ডিম পাড়ে, বাচ্চা হবে। এসব বিক্রী করে অনেক অর্থ রোজগার করা যাবে। এই কথা ভাবল প্রাণেশ্বর।

তারপর প্রাণেশ্বর ছোট ভাই কনকে-শ্বরকে বলল, "ভাই, বাবা সব কিছু আপোষে ভাগ করে নিতে বলেছেন। তাই ভাবছি, মুরগীগুলো আমি নিয়ে নি। আর তার চেয়ে অনেক দামী জিনিস কুকুর তুমি নিয়ে নাও। কুকুরের সাহায্যে তুমি অনেক রোজগার করতে পারবে। তোমার কি মত?" প্রাণেশ্বর জিজ্ঞেস করল।

অমায়িক কনকেশ্বর তাতেই রাজী হোল। কনকেশ্বরের দোরগোড়ায় কুকুর বাঁধা হোল।

কিছুদিনের মধ্যেই কনকেশ্বরের টান পড়ল। কিছু রোজগার না করলে খেতে পারে না। কুকুরকেও খেতে দিতে পারছেনা। তাই সে কুকুর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বনে। ঐ কুকুরের সাহায্যে এক

অনু দাস

হরিণ শিকার করে তা শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে ভাল রোজগার করল। প্রয়োজনীয় সব কিছু সে কিনে আনল বাজার থেকে।

প্রত্যেক দিন কনকেশ্বর কুকুর নিয়ে বনে যেত। কোন-না-কোন জন্তু শিকার করে শহরে বিক্রী করে রোজগার করতে লাগল। এই ভাবে অল্প দিনের মধ্যে কনকেশ্বর অনেক রোজগার করল।

এসব দেখে প্রাণেশ্বরের কনকেশ্বরের উপর ও তার কুকুরের উপর ভীষণ ঈর্ষা জাগল। যে কোন ভাবে ঐ কুকুরকে মেরে ফেলার প্রতিজ্ঞা করল।

সন্ধ্যের দিকে কনকেশ্বর কোথায় যেন গিয়েছিল। প্রাণেশ্বর তাড়াতাড়ি ভাতের সাথে বিষ মিশিয়ে ঐ কুকুরকে খেতে দিয়ে ঝট করে নিজের ঘরে ঢুকে কি যেন একটা কাজ করতে লাগল।

প্রাণেশবরের মনে আনন্দ আর ধরে না। ছোট ভাইয়ের কুকুর এখন মারা যাবে। কুকুর মারা গেলে শিকার হবে না। শিকার না হলে রোজগার হবে না। অপর পক্ষে তার নিজের মুরগীগুলো প্রতিদিন ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয়।

কুকুর বিষ মাখানো ভাত পেটে রাখতে না পেরে প্রাণেশ্বরের ঘরের পেছনে গিয়ে সব বমি করে দেয়।

তার কিছুক্ষণ পরে প্রাণেশ্বরের মুরগী গুলো ওদের ঘরের পেছনে গিয়ে ঐ বমি করা ভাত খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেলল। অন্ধকার হয়ে গেলে প্রাণেশ্বর সমস্ত মুরগী খোপরে পুরে রাখল।

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গার পর প্রাণেশ্বর ভাবল কনকেশ্বরের কুকুর নিশ্চয় মারা গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে দেখতে পেল কনকেশ্বর কুকুর নিয়ে অন্য দিনের মতই বেরুচ্ছে।

কুকুরের বেঁচে থাকতে দেখে প্রাণেশ্বর অবাক হোল। বিষে কোন কাজ হোলনা। তারপর সকাল হয়ে গেছে তাই মুরগী-দের ছাড়ার জন্য খুপরীর কাছে এসে দেখে সব মুরগী মরে পড়ে রয়েছে।

স্বামীর খোঁজে

দুই

হাঁটতে হাঁটতে মল্লিকা দেখতে পেল সেই গ্রামে এক পক্বকেশ বৃদ্ধা সুতা কাটছে। কাটতে কাটতে বলছে, "এই বুদ্ধবর্মা কি রকম নীচ প্রকৃতির মানুষ রে বাবা ?"

"বুড়ি মা, তুমি ঐ ভদ্রলোককে গাল দিচ্ছ কেন ?" মল্লিকা বলল।

"তুমি শোননি বাবা লোকটার কাণ্ড ? সবাই ওর নিন্দে করছে।" মল্লিকাকে পুরুষ ভেবে বৃদ্ধা বলল।

সেই সময় ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করল একজন, "বুদ্ধবর্মার স্ত্রীর খোঁজ যে দিতে পারবে তাকে অনেক পুরস্কার দেওয়া হবে। কেউ যদি তাকে লুকিয়ে রাখে তার মুণ্ডু কেটে নেওয়া হবে। এ হোল রাজার আদেশ।"

ব্রাহ্মণ পত্নী আনন্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আপন খেয়ালে বলল, "বেশ করেছ মল্লিকা, ভাল করেছ। ঐ বুড়োটাকে নিয়ে ঘর কোরনা। তোমার স্বামী যজ্ঞগুপ্তই।"

এই কথা শুনে বুড়ির ওপর মল্লিকার বিশ্বাস জাগল। সে ঐ বুড়িকে নিজের সব কথা খুলে বলল। বুড়ি সস্নেহে তাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। কাপালিকের পোষাক ছাড়িয়ে তার স্নানের ব্যবস্থা করল। খাওয়াল, ঘুমোতে বলল।

পরের দিন মল্লিকা কাপালিকের পোষাক পরে শহরে পৌঁছে দেখল যত্র-তত্র লোকের জটলা। মল্লিকা ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে ?" লোকটা জবাবে বলল, "এখানে বুদ্ধবর্মা নামে এক ব্যবসাদার আছে। ওর এক কুঁজো ছেলে আছে। এক ব্রাহ্মণ যুবক এক সুন্দরী কন্যাকে

রীণা ভট্টাচার্য

বিয়ে করে এই কুঁজোটার হাতে সঁপে দিল। তার ফলে ঐ কন্যা পালিয়ে গেল।"

"ঐ পাজী ব্রাহ্মণ যুবকের বাড়ি দেখাতে পারেন?" মল্লিকা ঐ লোকটাকে প্রশ্ন করল। ঐ লোকটা মল্লিকাকে যজ্ঞগুপ্তের বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

যজ্ঞগুপ্তের বাড়ি অতি সাধারণ ধরনের। বাড়ির এক কোনে যজ্ঞগুপ্ত শিষ্যদের পড়াচ্ছিল।

মল্লিকা সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোন্ গ্রন্থ পড়াচ্ছেন?"

"মনুধর্মশাস্ত্রের বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যাখ্যা করছি।" যজ্ঞগুপ্ত বলল।

"তোমার কোন অধিকার নেই তা পড়ানোর। তুমি নিজে অন্য বর্ণের মেয়েকে বিয়ে করেছ সেই কনেকে এক কুঁজোর হাতে সঁপে দিয়ে কোন্ আক্কেলে ধর্ম-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করছ?"

"পিতার আজ্ঞা পালন করা ছেলের কর্তব্য। রামচন্দ্র কি করে ছিল?" বলল যজ্ঞগুপ্ত।

"তুমি অবতার পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের সাথে নিজের তুলনা করছ? বেশ তো, পিতার আদেশে না হয় বিয়ে করলে কিন্তু কোন্ অপরাধে তুমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করলে?" মল্লিকা আবার [illegible] করল।

যজ্ঞগুপ্ত এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারল না।

সেদিন থেকে প্রত্যহ দিনের বেলা
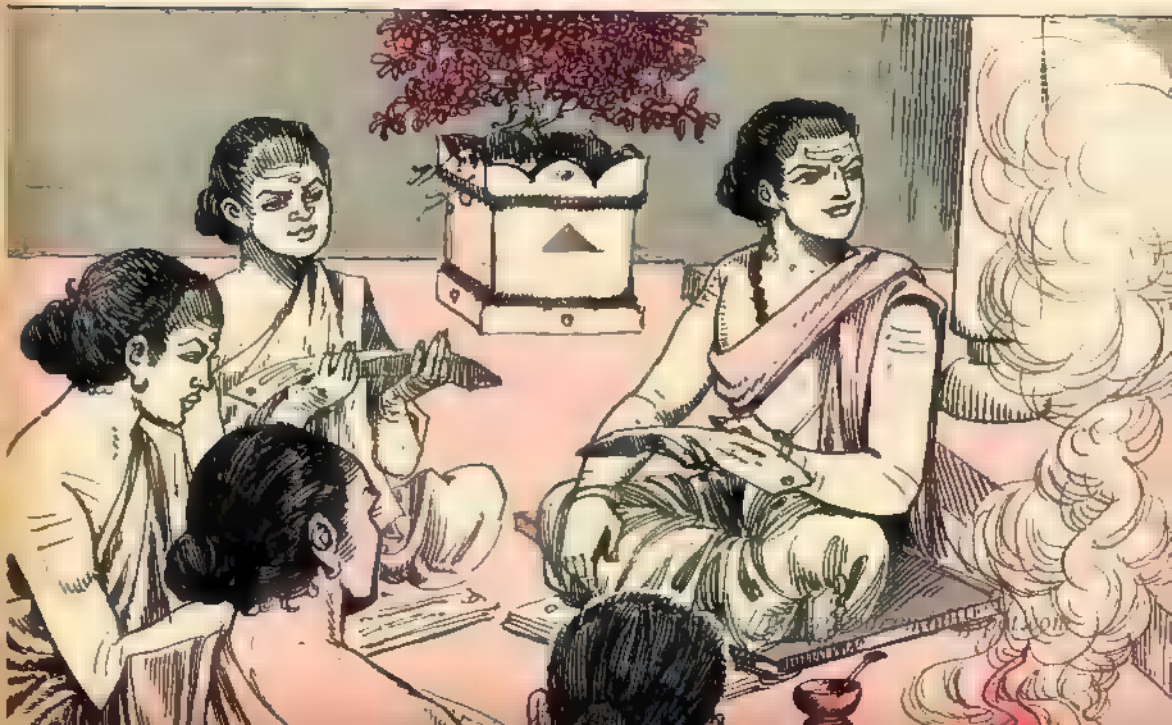
মল্লিকা কাপালিকের পোষাকে যজ্ঞগুপ্তের বাড়িতে কাটাত। আর রাত্রে ব্রাহ্মণীর বাড়িতে থাকত।

মল্লিকা বুঝতে পারল যজ্ঞগুপ্তের বিয়ে করার মূলে ছিল তার দারিদ্র, অর্থের লোভ। তাই সে ঠিক করল অর্থ দিয়েই তাকে আকর্ষণ করবে। মল্লিকা নিজের মুক্তার হার বিক্রী করল। সেই অর্থের অংশ দিয়ে বাসনপত্র কিনল। গাঁয়ের বাইরে পুঁতে দিল। তারপর সে যজ্ঞগুপ্তকে বলল, "আমার মত লোকের পক্ষে এক জায়গায় পাঁচ দিনের বেশি থাকার উপায় নেই। কিন্তু তোমার উপর আমার একটা দয়ার ভাব জাগায় পাঁচ দিনের বেশি রয়ে গেলাম। আমার কাছে মহাকাল মন্ত্রের গ্রন্থ রক্ষিত আছে। সেই গ্রন্থ পড়লে পৃথিবীর সমস্ত খাজানার সন্ধান মেলে। চাওতো আমার সাথে এসে সেই খাজানার সন্ধান পেতে পার।"

তারপর যজ্ঞগুপ্ত নিজের দু একজন বিশ্বাসী শিষ্যকে সাথে নিয়ে মল্লিকার পেছনে গিয়ে গাঁয়ের বাইরে এক জায়গায় খুঁড়ে তামার বাসনপত্র বের করে বাড়ি ফিরল। বাবাকে জানাল সমস্ত ব্যাপার। মহাকাল গ্রন্থ যে কাপালিকের কাছে আছে তাও জানাল।

"তাই নাকি? তাহলে আর এ সব শাস্ত্র পড়ে কি হবে। ছেড়ে দাও এসব পড়া। ঐ কাপালিকের কাছে গিয়ে মহাকাল মন্ত্র শেখ। তারপর কাপালিকের
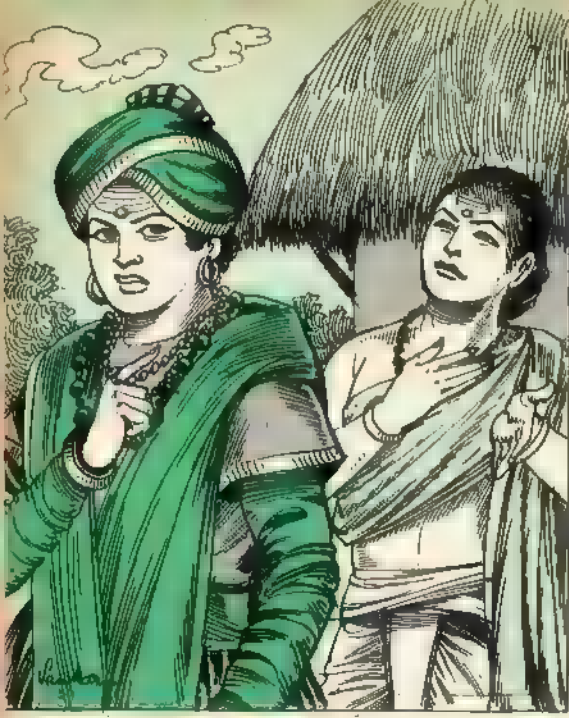
সাথে লেগে থেকে যতদিন না ঐ গ্রন্থ পাও তাঁর সেবা করে যাও।" যজ্ঞগুপ্তের বাবা ছেলেকে পরামর্শ দিল।

যজ্ঞগুপ্ত কাপালিককে তার কাশী যাত্রার আগে কাকুতি মিনতি করে বলল, "প্রভু, আমার মত পাপীর পক্ষে তীর্থযাত্রা ছাড়া পুণ্য অর্জনের আর কোন্ পন্থা আছে।"

মল্লিকা এমন অভিনয় করল যেন সে যজ্ঞগুপ্তকে তার সাথে যেতে বারণ করছে। শেষে অবশ্য যাওয়ার অনুমতি দেয়। দুজনে কাশী পৌঁছাল। সেখানে কিছুদিন থাকার পর নৈমিশ্যারণ্য হয়ে গঙ্গার উৎস মুখে পৌঁছাল। সেখানে কুরু, পুষ্কর, মহালয় ইত্যাদি পুণ্যতীর্থ সেরে উজ্জয়িণী পৌঁছাল।

মল্লিকা যজ্ঞগুপ্তকে বলল, "উজ্জয়িণী যাওয়া তোমার উচিত হবে না। সেখানে তুমি মহা অপরাধ করেছ। উজ্জয়িণীর অধিবাসী তোমাকে ক্ষমা করবে না। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।"

"প্রভু, শিষ্য কি কখনও গুরুকে ছাড়তে পারে?" যজ্ঞগুপ্ত বলল।

শেষে দুজনে উজ্জয়িণী পৌঁছাল। তখন মল্লিকা যজ্ঞগুপ্তকে ভদ্রবট নামক এক স্থানে পৌঁছে দিয়ে বলল, "একটি খাজানার তদন্তে বেরুচ্ছি। যতক্ষণ না তা রসন্ধান পাই আমি ফিরব না। আমার ফিরতে দেরি হলে ঘাবড়ে যেয়ো না।"

তারপর মল্লিকা সিপ্রা নদীর তীরে যায়, কাপালিকের পোষাক ঠিক মত পরা আছে কিনা দেখে নিয়ে নিজের বাপের বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষে চায়। ভিক্ষে দিতে মল্লিকার এক পরিচারীকা বাইরে এসে মল্লিকাকে ঠিক চিনতে পেরে চট করে ভেতরে ঢুকে গৃহকর্ত্রীকে বলে, "ওমা, আজ আমাদের কি আনন্দ! আপনার মেয়ে কাপালিকের পোষাকে দ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইছে। নিজের চোখে দেখে আসুন।"

মল্লিকার মা বাইরে এসে মেয়েকে

কাছে টেনে নিয়ে কাপালিকের পোষাক টেনে খুলে ফেলে চান করিয়ে বলে, "এসব কি করছ মা ?"

"আচ্ছা মা, তুমি ভাবছ আমি সত্যি সত্যি কাপালিনী হয়ে গেছি না ? বাবাকে ডাকো, আমি আগাগোড়া যা করেছি বলছি।" মল্লিকা জবাবে বলল।

সাগরদত্তকে দেখে মল্লিকা বলল, "বাবা, আপনাদের জামাই ভদ্রবটে আছে। ওঁকে আনতে ভাইদের পাঠিয়ে দিন।"

যজ্ঞগুপ্তের কাছে গিয়ে তার শ্যালকরা বলল, "পাজী কোথাকার, এখানে লুকিয়ে আছ। চল রাজার কাছে। আজ তোমার বিচার হবে।"

যজ্ঞগুপ্ত বুঝল আজ তার মৃত্যু নিশ্চিত। তাই বলল, "আমার মিত্র কাপালিকের ফেরা পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন।"

মল্লিকার ভাইরা মনে মনে হেসে বলল, "তোমার মিত্র আর কোথায় ? তার যেখানে যাওয়ার সেখানে পোঁছে গেছে। সেই তো তোমাকে ধরিয়ে দিল।" এই কথা বলে তারা যজ্ঞগুপ্তকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে গেল।

জামাইকে সাদরে সাগরদত্ত বুকে টেনে নিল। সব্বাই তাকে ঘিরে রইল।

স্বামীর জন্য মল্লিকা যা যা করল সব বিস্তারিত জেনে যজ্ঞগুপ্ত বলল, "লোকে বলে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের বুদ্ধি কম। এ ঢাহা মিথ্যা। পাণ্ডবরা কিছুতেই বিরাট রাজার প্রাসাদে অজ্ঞাতবাস করতে পারত না যদি দ্রৌপদী না থাকতেন।"

মুখে মুখে মল্লিকাব কাহিনী সেদেশের রাজার কানেও পেঁাছে গেল। রাজা মল্লিকা এবং যজ্ঞগুপ্তকে ডেকে পাঠালেন। রাজা উপহার দিয়ে মল্লিকাকে বললেন, "মা, তোমার স্বামী যাতে ব্রাহ্মণের কর্তব্য ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখ।"

তারপর যজ্ঞগুপ্ত সস্ত্রীক সুখে জীবন যাপন করতে লাগল। যশও সে পেল।

রোজগার

এক গ্রামে এক গৃহস্থ ছিল। লেখাপড়া করা না থাকলেও বুদ্ধি ছিল তার খুব। একবার তার দশ টাকার দরকার পড়েছিল। কত চেষ্টা করল দশটি টাকা পাওয়ার জন্য। কিন্তু পেলনা।

শহরে তার পরিচিত এক উকিল ছিল। সে উকিলের কাছে গিয়ে বলল, "উকিল মশাই, আপনি লেখা পড়া করেছেন আবার বুদ্ধিও আছে অনেক। আমি লেখা পড়া না করা গো-মূর্খ। আপনাকে আমি একটি প্রশ্ন করছি। আপনি তার জবাব না দিতে পারলে আপনি আমাকে কুড়ি টাকা দেবেন। আর আপনিও আমাকে একটা প্রশ্ন করবেন। আমি জবাব না দিতে পারলে দশ টাকা হারব। আমি যে গরীব, তাই।"

উকিল গেরস্থের এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।

"তিনটি পা আর দুটো ন্যাজের পাখী কোনটা?" গেরস্থ উকিলকে জিজ্ঞেস করল।

উকিল জবাব দিতে পারল না। গেরস্থকে কুড়ি টাকা দিতে দিতে বলল,"আমিও তোমাকে ঐ প্রশ্নটাই করছি, জবাব দাও।"

"আমিও হেরে গেছি উকিল মশাই।" বলে গেরস্থ উকিলের হাতে দশ টাকা দিয়ে বাকি দশ টাকা নিজের পকেটে পুরে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। —শ্যাম পাহাড়ী

আলা ভোলা

এক গ্রামে জানকী নামে এক বিধবা ছিল। তার রামু নামে এক আলাভোলা ছেলে ছিল। তার মা অনেক কষ্টে তাকে লালন পালন করে বড় করল।

একদিন জানকী রামুকে বলল, "বাবা, কোথাও গিয়ে একটা কাজের খোঁজ কর। কাজ না করলে দু পয়সা রোজগার হবে কি করে।"

"ভাল কথা মা। আমাকে খাবার বানিয়ে দাও। শহরে গিয়ে কাজের খোঁজ করে সন্ধ্যের সময় ফিরব।" বলল রামু।

জানকী খাবার বানিয়ে পোঁটলা বেঁধে রামুর হাতে দিল। রামু তা নিয়ে শহরের দিকে রওনা দিল। কিছুদূর যাওয়ার পর রামু ক্লান্ত হয়ে যায়। খিদেও পায়। তাই সে এক পুকুরের ধারে গাছের নিচে বসল। খাবার খেয়ে জল খেল। তারপর ঐ গাছের নিচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতেই রামু দেখে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঠিক তখনই সে দেখল একটা গিরগিটি নিজের মাথা একবার উপর আর একবার নিচের দিকে দোলাচ্ছে। রামু ভাবল গিরগিটি তাকে হয়ত জিজ্ঞেস করছে, "কি চাই?"

রামু বলল, "কাজ চাই।" গিরগিটি আবার মাথাটাকে উপর-নিচ করল।

"ও তুমি আমাকে কাজ দেবে? তা-হলে কাল থেকেই তোমার কাজে লেগে যাব। এখন তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে।" বলে রামু বাড়ি ফিরে গেল, মাকে বলল যে সে কাজ পেয়ে গেছে।

তারপর থেকে প্রত্যেক দিন রামু খাবার নিয়ে যেত। ঐ গাছের নিচে বসে খেত। জল খেত আর ঘুমোত।

গিরগিটি কাজ দিলে কাজ করবে, এই হোল রামুর মনোভাব। এই ভাবে

ভক্তি দত্ত রায়

এক মাস কেটে গেল। তার মা বলল, "হ্যাঁ, রামু, তোর মালিক তোর মাস মাইনে দেয়নি ?"

"আজকেই মাইনে চাইব মা।" বলল রামু। সেদিন সে ঐ গাছের নিচে বসে খাবার খেয়ে ঘুমালো না। ঠায় বসে রইল রামু। ঐ গিরগিটির অপেক্ষায়। ঘুম পেলেও ঘুমালো না। অনেকক্ষণ পরে সে গিরগিটিকে দেখতে পেল। গাছের নিচের এক গর্ত থেকে সে বেরুচ্ছিল। রামু তাকে প্রশ্ন করল, "আমি এক মাস ধরে তোমার কাজে আসি, আমাকে মাইনে দাও।" গিরগিটি সেই মাথা নাড়াচ্ছে।

"ও কাল দেবে ? ঠিক আছে।" রামু বলল। বাড়ি ফিরে এসে রামু মাকে বলল, "কাল মাইনে দেবে বলেছে।"

পরের দিন রামু গিরগিটিকে দেখেই বলল, "মাইনে এনেছ ?" গিরগিটি যথারীতি মাথা উপর নিচে নাড়াল।

ওর এই একইভাবে মাথা নাড়ানো দেখে রামুর ভীষণ রাগ ধরল। সে একটা ঢিল হাতে তুলে নিয়ে গিরগিটির দিকে ছুঁড়ল। গিরগিটি ঘাবড়ে গিয়ে গাছ থেকে নেমে ঐ গর্তের ভিতর ঢুকে গেল।

রামু ভীষণ ভাবে খেপে গিয়ে ছুটে বাড়ি গিয়ে শাবল এনে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে অনেকখানি খুঁড়ে ফেলল। কিন্তু গিরগিটির পাত্তা নেই। সে কোন্ ফাঁকে কোথায় পালিয়েছে। রামুর জিদ তখনও রয়েছে। সে খুঁড়ছে তো খুঁড়ছেই। অবশেষে হঠাৎ তার শাবলের ঘা লাগল মণি মুক্তোভরা এক কলসির গায়ে।

যত পারল ঐ মণি মুক্তো পকেটেপুরে বাড়ি ফিরে মাকে দেখাল। মার প্রশ্নের জবাবে রামু আদ্যোপ্রান্ত যা ঘটল সব জানাল। অন্ধকার হয়ে গেলে জানকী ছেলেকে নিয়ে ঐ গাছের নিচের গর্তের কাছে এসে ঐ কলসি তুলে বাড়ি নিয়ে গেল। তারপর থেকে আলাভোলা রামুর জীবনে আর কাজ করার দরকার পড়ল না।
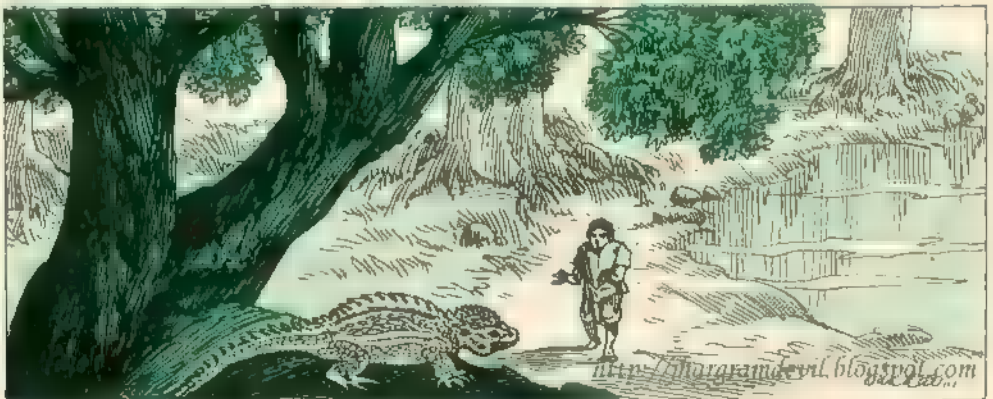
ধর্মদাতা

সেকালের কথা। বাগদাদ শহরে এক লক্ষপতি ছিল! অনেক দান-ধর্ম করে সে ধর্মদাতা নামে যশ প্রাপ্ত হয়। সেই নগরেই আর এক লক্ষপতি ছিল। সে ছিল খুব লোভী। সে কোনদিন কাউকে এক কাণাকড়িও দান করত না। সেইজন্য লোকে যেখানে ধর্মদাতার প্রশংসা করত সেখানে ঐ লোভীটার নিন্দেও করত।

লোভী ভাবল তার এই অপযশ দূর করতে হবে। সে তার এক বিশ্বাসী চাকর আব্দুল রজাককে একটা উপায় বের করতে বলল। আব্দুল রজাক ভেবে বলল, "লোকের কাছ থেকে ধর্মদাতা হিসেবে যশ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। এর চেয়ে সহজ পন্থা আছে। ধর্মদাতা নামে যে যশ পেয়েছে তাকে দিয়ে কৌশলে যশ প্রচার করানো সহজ ব্যাপার। ধর্মদাতাকে একদিন আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করুন। আমি নানান পোষাক পরে আপনার কাছে ভিক্ষে করতে আসব। আপনি প্রত্যেকবার একশো দীনার আমাকে ভিক্ষে দিয়ে যাবেন। সেই দৃশ্য দেখে উনি সবার কাছে আপনার দানের কথা প্রচার করবেন। এইভাবে আপনার যশ ছড়িয়ে পড়বে।" বলল আব্দুল রজাক।

"তোমার পরামর্শ মনে হচ্ছে ভাল। তুমি কালকেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে আমার বাড়িতে আসার নিমন্ত্রণ করে এসো।" লোভী বলল।

আব্দুল রজাক ধর্মদাতার বাড়ি গিয়ে নিজের মালিকের নাম জানিয়ে বলল, "হুজুর, কাল সকালেই আমার মালিকের বাড়ি যাওয়ার এবং খাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আপনাকে বিশেষ ভাবে

অনুরোধ করার জন্য মালিক আমাকে পাঠিয়েছেন।" আব্দুল সবিনয়ে বলল।

"তোমার মালিক তো কাউকে কাণা-কড়িও দেননা বলে শুনেছি। আমাকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করছেন এ বড় আশ্চর্যের ব্যাপার।" ধর্মদাতা বলল।

"হুজুর, আমার মালিকের ব্যাপারে লোকের প্রচারে কান দেবেন না। আসলে উনি কিন্তু বিরাট দাতা। তবে উনি প্রকাশ্যে কাউকে দান করেন না। গোপনে দান করেন। তৃতীয় জন ওঁর দানের কথা জানে না। কালকে আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।" আব্দুল রজাক বলল।

"ভাল কথা। তুমি তোমার মালিককে জানিয়ে দাও আমি কাল সকালেই যাব।" এ কথা জানিয়ে আব্দুল রজাককে বিদায় দিল। ওর চলে যাওয়ার পর ধর্মদাতা নিজের বিশ্বাসী চাকর আজীজকে ডেকে কী যেন বলল কিছুক্ষণ।

পরের দিন সকালে ধর্মদাতা লোভীর বাড়ি গেল। লোভী সাদরে তাকে ডেকে বসিয়ে কিছুক্ষণ পরে বলল, "দেখুন, আমার দানধর্ম সম্পর্কে প্রচার হোক এ আমি চাইনা। এ আমার একেবারে অপছন্দ। আমি দান করতে চাই যশলাভ করতে চাইনা।"

ওরা দুজন কথা বলার সময় আব্দুল রজাক এক ফাঁকে সরে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে সে এক অন্ধ ভিখারীর বেশ ধারণ করে নিজের মালিকের কাছে ভিক্ষে করতে এলো। লোভী থলি থেকে একশো দীনার বের করে ভিখারীর হাতে দিল।

অন্ধ ভিখারী যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে এক বৃদ্ধ ভিখারী এলো। লোভী থলি থেকে একশো দীনার বের করে তাকে দিল। দুপুরের মধ্যে এইভাবে একের পর এক ফকীর, বোবা, খোঁড়া প্রভৃতি বেশে দশজন ভিখারী এলো। প্রত্যেককে লোভী একশো দীনার করে দিল। আর মনে মনে চাকরের বেশ বদলের তারিফ করল।

ধর্মদাদা এসব লক্ষ্য করে লোভীকে বলল, "আপনার মত দান-ধর্মকারীকে আমি জীবনে দেখিনি। আমার চোখের সামনেই আপনি এক হাজার দীনার দান করে দিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার!"

"আপনার কাছে আশ্চর্য লাগলেও আমার কাছে এসব সাধারণ ব্যাপার।" লোভী বলল।

দুপুরে আব্দুল রজ্জাক নিজের সাধারণ পোষাকে ফিরে এসে অন্য ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। তার পিছু পিছু লোভী ঐ ঘরে ঢুকে বলল, "চমৎকার বেশ ধারণ করেছ। চিনতেই পারিনি। কোই, সব দীনার বের কর।" লোভী চাইল।

"নিন এই তিনশো দীনার।" এ কথা বলে আব্দুল রজ্জাক তিনশো দীনার দিল।

"কেন, কেন তিনশো কেন? আমি তো এক হাজার দীনার দিয়ে ছিলাম।" লোভী ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

"এক হাজার কেন হবে! আমি তো মাত্র তিনবার বেশ বদলে এসেছিলাম। আপনি আমাকে তিনবারে তিনশো দীনার দিয়ে ছিলেন।" বলল আব্দুল রজ্জাক।

"তুমি মাত্র তিনবার এলে, বাকি সাত বার ভিক্ষে করতে কে এলো?" লোভী চটে গিয়ে বলল।

"ঐ সাতবার হয়ত আমার চাকর আজীজ এসেছিল।" ধর্মদাতার কণ্ঠস্বর।

দুজনে ফিরে দেখে ধর্মদাতা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। লোভীর পেছন পেছন এসে আড়ি পেতে এতক্ষন ধর্মদাতা সব কথা শুনছিল। লোভীর মুখ সাদা হল।

"আজীজ কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। সেও বিশ্বাসী চাকর। আপনার অর্থ হারাবেনা।" ধর্মদাতা লোভীকে সাহস জোগাল।

ঠিক সেই সময় আজীজ এসে সাতশো দীনার লোভীর হাতে দিল। বিস্মিত ও অপমানিত হয়ে লোভীর চেহারায় কে যেন কালি ঢেলে দিল। লোভীর মুখ থেকে আর একটি শব্দও বেরুলো না। লোভীর ঘাড় হেঁট করা রইল।

মাতালের কথা

এক গ্রামে এক কাঠুরে ছিল। সে খুব মদ খেত। একদিন দুপুরে সে জঙ্গলে কাঠ কাটছিল। খুব জল তেষ্টা পেল তার। অনেকক্ষণ খোঁজ করার পর সে পাথরের টিলার মাঝে একটা পুকুর দেখতে পেল।

কাঠুরে তেষ্টা মিটিয়ে মনে মনে বলল, "এই পুকুরের সমস্ত জল যদি মদ হয়ে যেত আর টিলার পাথর সব মাংস হয়ে যেত, তাহলে আমি পেট ভরে মাংস আর মদ খেয়ে এখানেই মাথা কুটে মারা যেতাম।"

বনদেবী কাঠুরের কথা শুনে কাঠুরের কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য পুকুরের জলকে মদ আর টিলার পাথর সব মাংস করে ফেলল। কাঠুরে পেট ভরে মাংস খেল, প্রাণ ভরে মদ খেল আর ওখানেই শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার সময় ঘুম ভাঙ্গলে সে উঠে নিজের ঘরের দিকে হাঁটা দিল। তখন বন-দেবী দেখা দিয়ে বলল, "তোমার ইচ্ছা তো পূরণ হোল, এখন তুমি মাথা কুটে মরছ না কেন ?"

"হে দেবী, তুমি দেখছি বেশ সরল। একটা ম'দো মাতালের কথা তুমি বিশ্বাস কর ?" এই কথা বলে কাঠুরে নিজের বাড়ির দিকে চললো। —নফর প্রধান
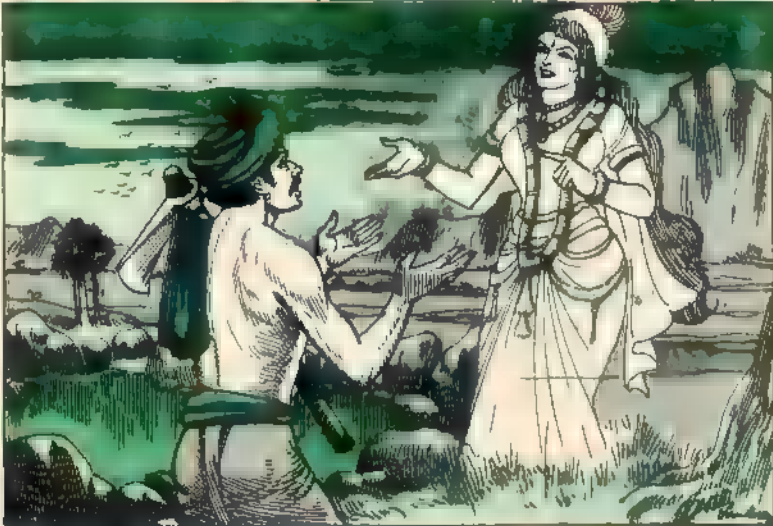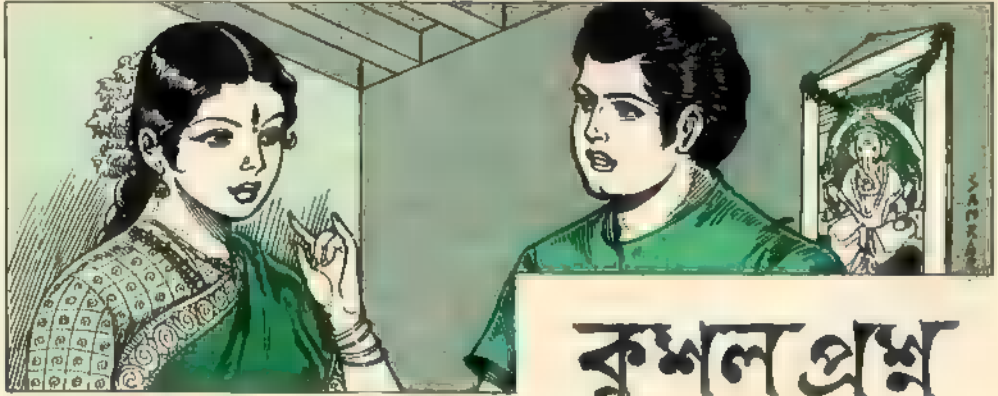
কুশল প্রশ্ন

এক গ্রামে এক ধনী ছিল। শঙ্কর নামে তার একটি ছেলে ছিল। শঙ্কর এক গরীব মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করল। বউটির নাম বিশালাক্ষী। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বউ-মাকে পছন্দ করত না। উপেক্ষা করত।

গরীব ঘরের মেয়ে বিশালাক্ষী প্রায়ই শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কাছে কথা শুনত। তার স্বামী শঙ্করের মাধ্যমে সে বাপের বাড়ির কুশল প্রশ্ন জানতে পারত। শঙ্কর এক-বার খবর আনল তার বাবা মেয়েকে দেখতে চায়।

বিশালাক্ষী স্বামীকে বলল, "বাবার কাছে ভাল কাপড় জামা না পাঠালে বাবা কি করে আসবে?"

কিছুদিন পরে জামাইয়ের পাঠানো জামা কাপড় পরে মেয়েকে দেখতে এলো বিশালাক্ষীর বাবা। শঙ্করের বাবা বেয়াইকে তেমন সাদর অভ্যর্থনা জানা-লোনা। বউমাকে বলল, "তোমার বাবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।"

বিশালাক্ষী বারান্দায় বাবাকে বসিয়ে কুশল প্রশ্ন করল। সে জানত বাবার সাথে কি ধরণের কথা হচ্ছে তা শোনার জন্য ঠিক তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী আড়ি পেতে শুনছেন। তাই সে কায়দা করে প্রশ্ন করল, "আমাদের সিন্দুক সব সময় বেশ ঝম্ ঝম্ আওয়াজ দিচ্ছে তো?" বিশালাক্ষীর বাপের বাড়ি কুঁড়ে ঘরের। দেয়ালগুলো ভেঙ্গে পড়ছিল। ঝড় উঠলে পড়ো পড়ো অবস্থা হতো।

"সিন্দুক তো মা আগের মতই আও-য়াজ দিচ্ছে।" ওর বাবা জবাবে বলল।

"ক্ষেতের ধান ভাল করে ঝাড়াই-বাছাইয়ের পরে যত্ন করে ঘরে তোলা হচ্ছে তো?" বিশালাক্ষী জিজ্ঞেস করল। ওদের বাড়ির লোক বেচারা খুদ কুঁড়ো

হারাধন চট্টোপাধ্যায়

জোগাড় করে এনে ঝেড়ে বেছে খেত।

"ওত্রে আনতেই হবে মা, সব ঠিক আগের মতোই চলছে।" বাবা বলল।

"বাড়ির কোনায় যে দাঁত দুটো ছিল তা ঠিক আছে তো? নতুন দাঁত লাগানোর যে কথা ছিল তা হয়নি?" মেয়ে আবার প্রশ্ন করল। দাঁত মানে হাতীর দাঁত নয়। বাঁশের খুঁটি।

"নতুন দাঁত লাগানোর কথা ভাবছি।" বিশালাক্ষীর বাবা বলল।

"আমাদের আকাশ-দীপ তেমনি আছে তো?" মেয়ের প্রশ্ন। ওদের বাড়ির চালে ফুটো ছিল। ওগুলো দিয়ে ওরা সূর্য চন্দ্র দেখত। তাই ঐ ফুটো গুলোর নাম রেখেছিল আকাশ-দীপ।

"হ্যাঁ মা তেমনি আছে। এখনো বদলানো হয়নি।" ওর বাবা বলল।

"মা, বোন আর ভাইদের হাতের মণি-মুক্তোগুলো তেমনি আছে তো?"

"সেগুলো তেমনি আছে মা।" বলল ওর বাবা। মা, বোন, ভাইদের হাতে হাজা ফোঁড়া হয়েছিল। সেগুলো সেরেছে কিনা জানতে চাইল।

প্রশ্ন করে যা জানতে পারল তাতে বিশালাক্ষীর মনে দুঃখ হোল। বাপের বাড়ির কোন উন্নতি হয়নি। এতক্ষণ আড়ি পেতে শুনে শ্বশুর-শাশুড়ীর ধারণা হোল তাদের বেয়াই গরীব তো নয়ই, বরং বেশ ধনী।

তৎক্ষণাৎ শাশুড়ী বাইরে এসে বউ-মাকে বলল, "তোমার বাবা এসে কতক্ষণ হয়ে গেল, এখনো তাঁকে খালি ▬ করে চলেছ! হাত মুখ ধোয়ার জলও এগিয়ে দাওনি! অ্যাঁ?"

বিশালাক্ষী বুঝল তার বাবাকে ঐ ভাবে প্রশ্ন করায় কাজ হয়েছে। তারপর তার বাবাকে শ্বশুর-শাশুড়ী শুধু যে সসম্মানে আদর আপ্যায়ন করল তাই নয় রীতি অনুযায়ী নতুন ধুতি দিয়ে বিদায় দিল। জামাই শঙ্করও গোপনে তার শ্বশুরের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে প্রণাম করে বিদায় দিল।

বিনিদ্র রাজা

সেকালের কথা। সে দেশের রাজার কোন কিছুর অভাব ছিল না। ঐশ্বর্যে ভরপুর। সারা বছর ধরে রাজার উদ্যানে নানান রকমের ফুল ফুটতো। উদ্যানের অন্য পাশে রাজার শিকারের এক বিশাল বন ছিল। রাজা সেখানে শিকার করতেন।

রাজার সব রকমের সুখ ছিল। ছিল না একটির। রাজার চোখে ঘুম ছিল না। কিছুতেই ঘুম পেত না। এই নিদ্রা সুখ থেকে রাজা একেবারেই বঞ্চিত ছিলেন। এই রোগ সারানোর জন্য রাজা বহু বৈদ্য বা চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন। কত চিকিৎসক এলেন, কত ওষুধ খেলেন কিন্তু কোন ফল হোল না।

সারারাত বিছানায় ছটফট করে রাজার বিরক্তি ধরে যেত। মনে হোত তাঁর জীবন বৃথা। একদিন রাজা ভোরে এক সাধারণ লোকের পোষাক পরে কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। চলে গেলেন জঙ্গলে। হাঁটতে লাগলেন। কিসের যেন শব্দ ভেসে এলো তাঁর কানে। যে দিক দিয়ে শব্দ আসছে সেদিকে তিনি এগিয়ে গিয়ে দেখলেন একটা লোক কুঠার দিয়ে গাছ কাটছে। রাজা ভাবলেন, বেচারা কত পরিশ্রম করছে। রোদও বাড়ছে। চড় চড় করে।

কিছুক্ষণ পর লোকটা কুঠার নিচে রেখে নিজের ময়লা কাপড় দিয়ে ঘাম মুছে মাটিতে সটান্ শুয়ে বলে ওঠে, "উফ্ মাগো!" তারপর লোকটা পাশ ফিরেই অচেনা একজনকে দেখে ঝট্ করে উঠে বসে।

রাজা দরদী চোখে কাঠুরের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলেন, "তুমি হয়তো ক্লান্ত হয়েছ। কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।"

"আপনাকে মশাই দেখেই প্রথমে

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

ভেবেছিলাম আমাদের সর্দার। তাই ভয় পেয়ে গিয়ে ছিলাম। আপনাকে দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে আপনি কোন পরিশ্রমই করেন না।" কাঠুরে বলল।

"ঠিকই বলেছ।" রাজা জবাব দিলেন।

"আপোনার পোষাক ধব্‌ধবে পরিষ্কার। আপনার হাত দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ নরম। আমার হাত দেখুন কি রকম কড়া পড়ে গেছে। আপনি বোধহয় পোষাক সেলাই করা দর্জি।" কাঠুরে বলল।

"আমি দর্জি নই। সে যাই হোক। আচ্ছা এত পরিশ্রমের পর তোমার ঘুম কি করে পায়?" রাজা জিজ্ঞেস করল।

কাঠুরের কাছে এই প্রশ্ন পাগলের প্রশ্নের মত লাগল। হো হো করে হেসে উঠে বলে, "আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুমোতে পারি। ছারপোকা কামড়ালেও আমি টের পাই না।"

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" রাজা বললেন।

"আপনি বিশ্বাস করছেন না? আমার কাছে টাকা থাকলে আমি টানা এক সপ্তাহ ঘুমোতাম। কিন্তু আমি যে গরীব। কাজ না করলে আমার বউ-ছেলে-মেয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাবে।" কাঠুরে বলল।

আচ্ছা তুমি শোননি, আমাদের রাজার ঘুম পায় না।" রাজা বলল।

আমিও তো ভেবে পাই না কেন ঘুম পায় না। তাঁকে তো আমার মত খাটতে হয় না। ঘুমানোর ভাল মোলায়েম নরম বিছানা আছে। কেন যে ওঁর ঘুম পায় না।" কাঠুরে বলল।

রাজা মৌন রইলেন। কাঠুরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, "আমি আর বসে বসে কথা বলতে পারব না। আমাদের সর্দার এসে যাবে। আমাকে বসা দেখলে একেবারে দূর করে দেবে।" এই কথা বলে কাঠুরে আবার কুড়ুল হাতে তুলে নিয়ে গাছ কাটতে লাগল।

কাঠুরের কাঠ কাটা রাজা আশ্চর্যের

সাথে লক্ষ্য করে মনে মনে বলল, রাজা হয়েও আমি ঘুমোতে পারছি না। এই কাঠুরে কেমন সুন্দর ঘুমোতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে রাজা কাঠুরেকে বলল, "তুমি ঐ গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়। তোমার ঘুমোনো আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।

"ভাল কথা বললেন। আমাকে সন্ধ্যের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে।" কাঠুরে বলল।

"সে ভাবনা তোমাকে করতে হবেনা। আমি তোমার কাজ করে দিচ্ছি।" এই কথা বলে রাজা কাঠুরের কাছ থেকে কুড়ুল কেড়ে নিল।

কাঠুরে রাজার দিকে আশঙ্কার দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন ভেবে গাছের ছায়ায় শুয়ে পরক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রাজা লোকটার ঘুম দেখে মনে মনে বললেন, আশ্চর্য! বিছানা নেই, বালিশ নেই, নিদেন পক্ষে একটা মাদুরও নেই। এ কেমন করে ঘুমোতে পারল।

হঠাৎ রাজার খেয়াল হোল, তাঁকে তো ঐ বাকি কাজটা করে দিতে হবে। তাই রাজা কুড়ুল নিয়ে ঐ গাছ কাটতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার শরীর ঘেমে গেল। আর পারছেন না। ঘেমে নেয়ে অস্থির। রাজা গায়ের জামা

খুলে ফেললেন।

অনেক পরিশ্রমের পর রাজার গাছ কাটা হোল। রাজার হাতের ছাল চামড়া যেন উঠে গেল। কোমর আর হাত ব্যথায় টন্ টন্ করতে লাগল। ক্লান্ত শ্রান্ত রাজা টলতে টলতে গিয়ে ঐ কাঠুরের পাশে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার চোখ ভারি হয়ে এলো। পরক্ষণেই গভীর ঘুমে যেন হারিয়ে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। সর্দার প্রত্যেকের কাজের হিসেব নিতে নিতে সেখানে পৌঁছে গেল। এসে দেখে তার কাঠুরে অন্য একটা লোকের পাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে! দেখে সর্দারের পিত্তি জ্বলে

গেল। কাজ ফেলে ঘুমোন হচ্ছে। গজ গজ করতে করতে সর্দার টেনে এক লাথি কষে বলল, "আরে হেই, ওঠ!"

রাজার ঘুম ছুটে গেল। সর্দারকে বললেন, "তুমি চেঁচাচ্ছ কেন? বেচারা কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ঘুমোতে দাও।"

"তুমি কে হে আমাকে বোঝাতে এসেছ? তুমি জান আমি এই জঙ্গলের সর্দার।" ভীষণ মেজাজে বলল সর্দার।

ফলে রাজার ভীষণ রাগ ধরল। দাঁত রগড়াতে রগড়াতে বললেন, "ওকে যদি তোল, তাহলে তোমার গলা টিপে দেব।"

সর্দার এই ধরনের কথা শুনে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। পেছতে পেছতে বলল, "আমি আবার আসছি। তোমাকে একচোট দেখে নেব।"

ইতিমধ্যে রাজপ্রাসাদে হৈ চৈ পড়ে গেল। ভোর থেকে রাজার কোন পাত্তা নেই। রাজার খোঁজে প্রাসাদের লোক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে একদল রাজার খোঁজে জঙ্গলেও এলো। রাজাকে যে সর্দার শাসিয়ে ছিল তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে ও মশাই, এখানে রাজাকে দেখেছেন?"

"রাজাকে আমি চিনি না। কিন্তু আমার এই জঙ্গলে একটা লোকের কথা শুনে মনে হচ্ছে ঐ ব্যাটাই রাজার রাজা। চল লোকটাকে দেখিয়ে আসি।" ওই কথা বলে ওদের নিয়ে গিয়ে সর্দার সাধারণ পোষাক পরা রাজার দিকে তর্জনি দেখাল।

রাজপ্রাসাদের লোক চিনতে পেরে রাজাকে বলল, "মহারাজ, আজ সকাল থেকে আমরা আপনাকে খুঁজছি।"

রাজা ঐ ঘুমন্ত কাঠুরেকে দেখিয়ে বললেন, "তোমরা এই লোকটাকে যত্ন করে রাজপ্রাসদে নিয়ে গিয়ে মখমলের বিছানায় শুইয়ে দাও। যতক্ষণ না লোকটা জাগে ততক্ষণ ঘুমোতে দাও। জাগার পর পেট ভরে খাইয়ে দিও। এই কাঠুরে আমার অসুখ সারিয়েছে। কোন বৈদ্য যা পারেনি এ তাই পেরেছে।"

পরের দিন সকালে কীচক রাজমহলে এসে দ্রৌপদীকে দেখে বলল, "তুমি আমার পরাক্রম দেখলে তো ? প্রকাশ্যে রাজসভায় তোমাকে কত ভাবে অপমান করলাম কিন্তু কেউ আমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারল না। বিরাট নামেই রাজা। দেশের সমস্ত সৈন্য আমার কথামত ওঠে বসে। আসলে আমিই রাজা। আমার হাতে তুমি নিজেকে সঁপে দিলে আমি ধন্য হব।" এই সব কথা বক বক করে বলতে লাগল কীচক।

"তুমি যদি সত্যি আমাকে চাও তো আমার কথামতো তোমাকে চলতে হবে। আমাদের গোপন ব্যাপার রাজসভায় অথবা তোমার ভাইদের কাছে প্রকাশ করা চলবে না। রাজসভায় অথবা তোমার ভাইরা জানলে আমার স্বামীরা জেনে যাবে। স্বামীদের আমি ভীষণ ভয় করি। আমার কথা মতো চললে আমি তোমার হাতে নিজেকে সঁপে দেব।" দ্রৌপদী বলল।

"আমি সবার চোখে ধুলো দিয়ে সোজা তোমার ঘরে ঢুকে যাব। তোমার স্বামীরা কিছুই জানতে পারবে না।" কীচক বলল।

দ্রৌপদী বলল, "রাত্রে নাচঘরে কেউ থাকে না। অন্ধকার হয়ে গেলে তুমি ঐখানে এসো। ওখানেই আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে। ওখানে দেখা হলে কেউ টের পাবে না।"
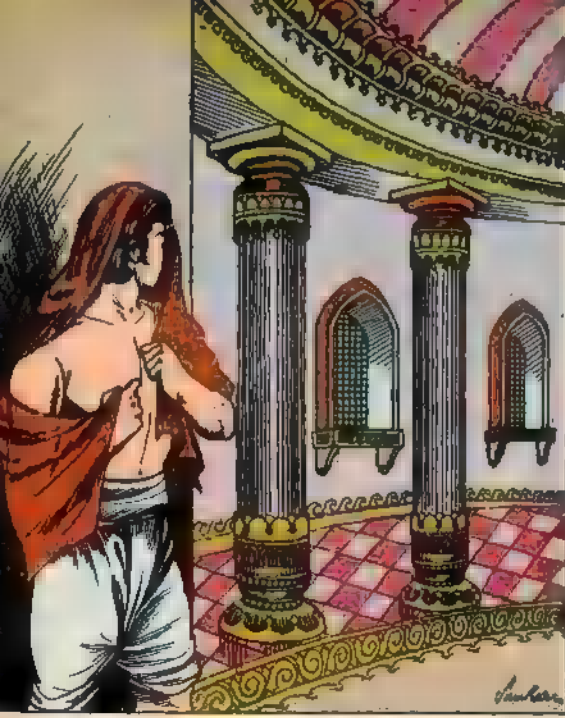
এরপর এক সুযোগে দ্রৌপদী ভীমের সাথে দেখা করে কীচকের সাথে যে কথা হয়েছে তা জানালেন।

কীচকের বুদ্ধি ছিল কম। সৈরিন্ধ্রী-রূপী দ্রৌপদীকে পাওয়ার জন্য সে পাগল।

আর অন্যদিকে কীচককে বধ করার পৈশাচিক আনন্দ ভীমের মনের মধ্যে নাড়া দিচ্ছে। ভীম উত্তেজিত হয়ে দ্রৌপদীকে বললেন, "গোপনে সম্ভব না হলে আমি প্রকাশ্যেই কীচককে বধ করব। ওখান থেকে সোজা গিয়ে দুর্যোধনকে মেরে ফেলবো। যুধিষ্ঠিরের অত যদি ইচ্ছে থাকে তো সে রাজা বিরাটের মনোরঞ্জনের চাকরি করুক।

দ্রৌপদী ভীমকে শান্ত করে বললেন, "কীচককে এমনভাবে বধ করবে যাতে আমরা আগে থেকে যে কথা ভেবে রেখেছি সেই কথা মত কাজ হয়।"

"আজ রাত্রে আমি তাকে ঠিক এমন ভাবে বধ করব যেই সে টের পাবে না যে প্রকৃত পক্ষে আমি কে।" ভীম বুঝিয়ে বলল।

সেই দিন রাত্রে ঘন অন্ধকারে ভীম নৃত্যশালায় গিয়ে গোপন জায়গা থেকে কীচকের জন্য এমন ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল যেন সিংহ অপেক্ষা করছে হরিণের জন্য। যথাসময়ে কীচক নিজেকে অনেক রকমের অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে সৈরিন্ধ্রীর সাথে দেখা করার প্রবল আগ্রহ নিয়ে গেলো। নৃত্যশালায় একটি বিছানা ছিল। ভীম শুয়ে ছিল সেই বিছানায়। অন্ধকারে ঠাওরাতে ঠাওরাতে কীচক ভীমের পিঠে হাত দিয়ে বলল, "আমি আমার অন্তপুর সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছি। তোমার জন্য অজস্র অলঙ্কার তৈরি করে রেখেছি। আমার অন্তপুরের মেয়েরা আমাকে কি বলে জান? বলে, আমার চেয়ে সুন্দর পুরুষ নাকি পৃথিবীতে আর নেই। এহেন পুরুষ আমি, তোমার জন্যে আজ এই অন্ধকারে একা এলাম।"

ওর কথার পিঠে ভীম বললেন, "তুমি সত্যি সুন্দর কিন্তু এমন ছোঁয়ার অনুভূতি আজ পর্যন্ত. বোধহয় তুমি পাওনি ।" এই কথা বলে ভীম বিছানা থেকে উঠে কীচকের চুল ধরে টানতে টানতে বলল, "সিংহ যেমন ভাবে হাতীকে মারে আজ আমি তোকে তেমন ভাবে মারব । আজ থেকেই সৈরিন্ধ্রী তোর পিণ্ডি দেবে ।"

কীচক এক ঝটকায় নিজের মাথার চুল ছাড়িয়ে নিল । দুজনেই মুখোমুখী । হাত দিয়ে, নখ নিয়ে, দাঁত দিয়ে একে অন্যকে মারে, আঁচড়ায় এবং কামড়ায় । কীচক নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুষি চালায় কিন্তু ভীম টলে না পড়ে না । পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে । ওদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ফলে নৃত্যশালা কেঁপে ওঠে ।

লড়তে লড়তে এক ফাঁকে ভীম কীচককে টেনে একলাথি মারেন, সাথে সাথে কীচক নিচে পড়ে যায় । কীচক উঠে দাঁড়াচ্ছে না দেখে ভীম তার বুকে দেন কয়েকটা আঘাত । তারপর তাকে শূন্যে তুলে ঘোরাতে থাকেন ভীম । তার গলা টিপে ধরেন । তারপর তার বুকে বসে ভীম ঘুষি মারতে মারতে জানোয়ারকে মেরে ফেলার মত মেরে ফেলেন কীচককে । মেরে ফেলেও শান্তি নেই ভীমের । হাত পা খুলি এক এক করে সব ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে মাংস আর হাড়ের স্তূপে পরিণত করে ।

পরিশেষে ঐ স্তূপের উপর এক লাথি মেরে, আলো জ্বেলে দ্রৌপদীকে দেখিয়ে ভীম বলেন, "তোমার উপর যার ঐ ধরনের কু-নজর পড়বে তার এই পরিণতি হবে ।" তারপর ভীম রান্না ঘরের দিকে চলে যান । পরক্ষণে দ্রৌপদী নৃত্যশালার সমস্ত চাকরদের ডেকে তুলে বলেন, "তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখ কীচককে কেমন হত্যা করেছে ।" তারা তৎক্ষণাৎ নাচ-ঘরে গিয়ে অবাক হয়ে যায় । তারা খুঁজে পেল না কীচকের হাত, পা, খুলি । কোথায় পড়ে রয়েছে কে জানে !

কীচকের আত্মীয় স্বজন সবাই সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন শবের চারদিক ঘিরে কাঁদতে লাগল। ঐ বীভৎস শবের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকে ভয়ে কেঁপে উঠল। শবকে দাহ করার জন্য নিয়ে যাবে এমন সময়, ক্ষুব্ধ উপকীচকরা দেখতে পেল অদূরে থামের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সৈরিন্ধ্রী-রূপী দ্রৌপদী।

"এরই জন্য আমাদের ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। ভাইয়ের শবের সাথে সাথে একেও পুড়িয়ে ফেললে ভাইয়ের আত্মা শান্তি পাবে।" এই কথা বলাবলি করে উপকীচকরা বিরাট রাজার কাছে গিয়ে কীচকের সাথে সৈরিন্ধ্রীকে পোড়া-নোর অনুমতি চায়।

রাজা বিরাটের বারণ করার সাহস ছিলনা। তাই অনুমতি দিলেন।

উপকীচকরা দ্রৌপদীকে কীচকের শবের সাথে বেঁধে তাকে শ্মশানে নিয়ে গেল। যাওয়ার পথে দ্রৌপদী আর্তনাদ করে নিজের স্বামীদের ছদ্মনাম ধরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, "জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল! এই কীচকের দল আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।"

ভীম তখনই শুয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করছিলেন। দ্রৌপদীর চিৎকার শুনে বলে উঠলেন, "সৈরিন্ধ্রী ভয় পেয়োনা, আমি তোমাকে ছাড়িয়ে আনতে যাচ্ছি।" তারপর পোষাক বদলে দেওয়াল টপকে ভীম শ্মশানের দিকে ছুটলেন।

শ্মশানে চিতা তৈরি করা ছিল। ভীম শ্মশানের পাশের একটি গাছ শেকড় সমেত উপড়ে উপকীচকদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ওকে দেখেই উপকীচকরা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "ওরে বাবারে বাবা! এ কে রে! মরে গেলাম রে!" তখন তারা দ্রৌপদীকে সেখানেই ছেড়ে সবাই নগরের দিকে ছুটে পালাতে লাগল। ভীম ঐ একশো পাঁচজন উপ-কীচককে মেরে ফেলে দ্রৌপদীকে বন্ধন

মুক্ত করে বললেন, "তুমি নিশ্চিন্তে রাজ-প্রাসাদে নিজের ঘরে যাও, আমি যাচ্ছি আমার রান্নাঘরে।"

উপকীচকদের শবের পাহাড় আর অন্তঃপুরের দিকে যাওয়া সৈরিন্ধ্রীকে দেখে নগরের লোক ভয়ে ভীত হয়ে রাজা বিরাটের কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, সমস্ত কীচক মারা গেছে। সৈরিন্ধ্রীকে মুক্ত করে এনেছে ওর স্বামীরা। ওরাই কীচকদের মেরেছে। সৈরিন্ধ্রী ■ দিকেই আসছে। ওকে যারা দেখে তারাই ওর সুন্দর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়। আর যারাই ওর রূপ দেখে মুগ্ধ হয় তাদেরই ওর স্বামীরা মেরে ফেলে। এই ভাবে আমাদের নগরের সবাই একে একে শেষ হয়ে যাবে। এখন, এমন কোন উপায় বের করুন যাতে সৈরিন্ধ্রীর জন্য আমাদের কোন ক্ষতি না হয়।"

রাজা বিরাট সমস্ত কীচককে একই চিতায় পোড়ানোর আদেশ দিয়ে রাণী সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে বলল, "সৈরিন্ধ্রী এখানে এলে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে ওকে এখান থেকে চলে যেতে বল। আর বল যে ওর জন্য আমার এখানে কখন যে কি হয়ে যায় আমি সেই ভাবনাতেই অস্থির। সেই জন্যই তোমার মাধ্যমে ওকে জানাচ্ছি।

দ্রৌপদী চান করে ফিরছিলেন। তাঁকে দেখে নগরবাসী ভয়ে এড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। ওদের ভয় দ্রৌপদীর স্বামীরা
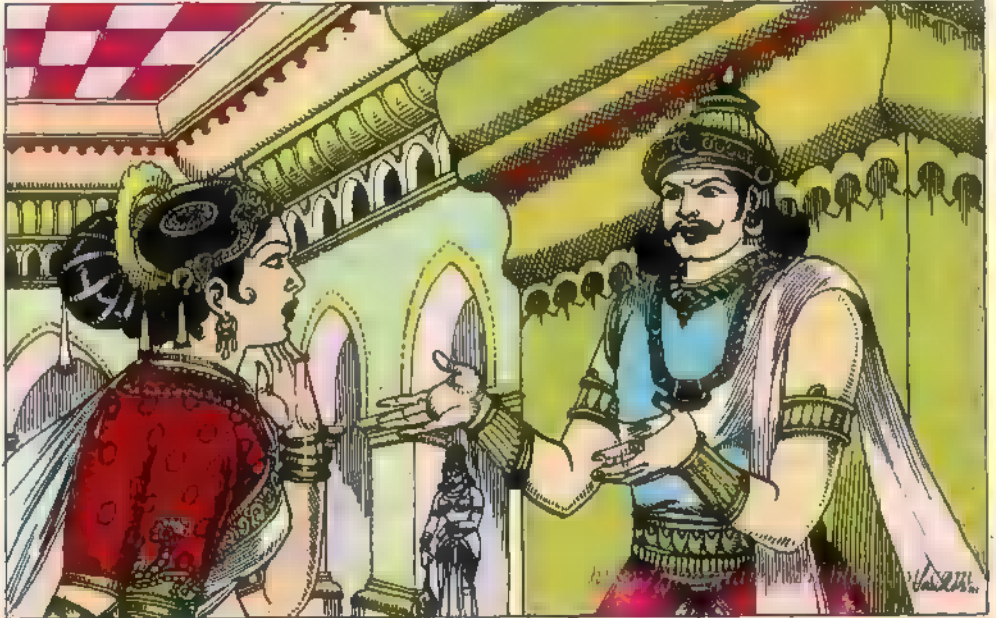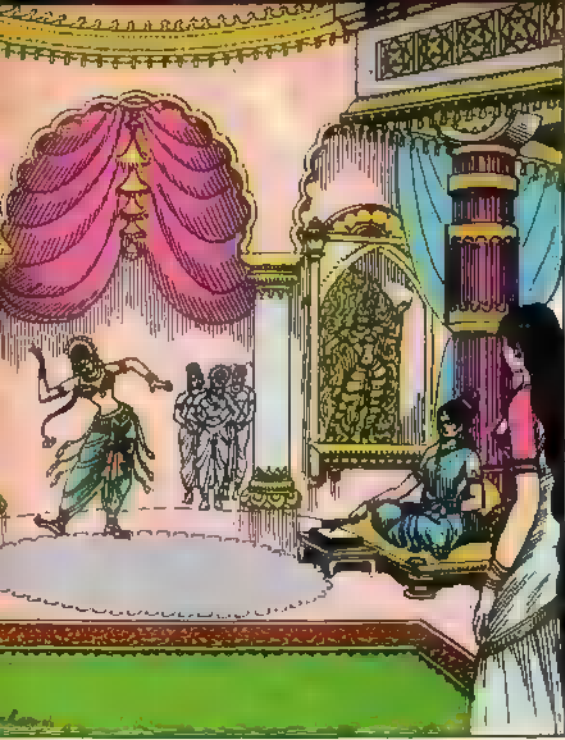
ওদের মেরে ফেলবে।

প্রাসাদে ঢুকে দ্রৌপদী নৃত্যশালায় রাজকুমারীদের নাচ শেখানোর গুরু অর্জুনকে দেখলেন। দ্রৌপদীকে দেখেই নৃত্যশালা থেকে অর্জুন এবং রাজ-কুমারীরা তাঁর কাছে এসে এক বিরাট বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাল।

অর্জুন দ্রৌপদীকে বললেন, "সৈরিন্ধ্রী তুমি ঐ বিপদ থেকে কেমন করে বেঁচে গেলে? সেই দুষ্টেরা কেমন করে মরল? সব বলতো শুনি।"

"বৃহন্নলা, তুমি এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছ? তুমি কি কোন ভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারতে? তুমি আরামে অন্তপুরে বসেছিলে, এখন সৈরিন্ধ্রীর অবস্থা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করতে এসেছ?" দ্রৌপদী চটে গিয়ে বললেন।

"তোমার সাথে আমার কত দিনের প্রীতের সম্পর্ক আর আমি এই ঘটনায় দুঃখিত হব না! একের মনের অবস্থা অন্যে আর কতটুকু বুঝতে পারে!" বললেন অর্জুন।

তারপর রাজকুমারীদের সাথে দ্রৌপদী যখন অন্তঃপুরে গেলেন তখন সুদেষ্ণা বলল, "সৈরিন্ধ্রী, তোমাকে আর তোমার স্বামীদের রাজা ভীষণ ভয় করছেন। তাই বলছি, তোমরা কোথাও চলে যাও।"

"মহারাণী, মহারাজ আর মাত্র তের দিন যদি দয়া করে এখানে থাকতে দেন তো আমার স্বামীরাই আমাকে নিয়ে যাবে। এরপর রাজা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সহ সুখে দিন যাপন করতে পারবেন।" দ্রৌপদী বললেন।

মহাবলশালী কীচক ও তার ভাইদের হত্যার খবর পেয়ে বিরাট নগরের লোক ভীষণ দুঃখ পেল। নগরে প্রান্তরে দেশে দেশান্তরে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জানল যে এক নারী ■ তার কয়েকজন স্বামী মিলে কীচক ■ তার ভাইদের হত্যা করেছে।

আর সেই সময়েই দুর্যোধনের গুপ্ত-চররা নানান দেশে, পাহাড়ে ও গ্রামে, নগরে-প্রান্তরে, তীর্থস্থান সমূহে ঘুরে ঘুরে খুঁজে অবশেষে পাণ্ডবদের খোঁজ না পেয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলো।

দুর্যোধন সভাসদ্‌দের বললেন, "আমি বুঝতে পারছি না আর কি ভাবে পাণ্ডবদের খোঁজ করা যায়। আপনারাও এ-বিষয়ে গভীরভাবে ভাবুন। পাণ্ডবদের অজ্ঞাত-বাস শেষ হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। এই সময় যদি ওদের সন্ধান পেতাম তাহলে পাণ্ডবরা কথা রাখার জন্য আবার বার বছর বনবাসে যেত!"

কর্ণ এবং দুঃশাসন আবার গুপ্তচর পাঠানোর জন্য দুর্যোধনকে বললেন। দ্রোণ বললেন, "পাণ্ডবরা অবশ্যই জীবিত আছে। সেই জন্য যে গুপ্তচররা পাণ্ডবদের ভাল ভাবে চেনে একমাত্র সেই গুপ্তচরদেরই পাঠানো হোক!" ভীষ্মও বললেন, "আমার বিশ্বাস পাণ্ডবরা বেঁচে আছেন। যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকবেন সেই দেশ সমৃদ্ধ হবে, মানুষ অনিন্দিত ও ধর্মপরায়ণ হবে, সেখানে ঠিক সময়ে বৃষ্টি হবে। অতএব, এহেন সমৃদ্ধ দেশ কোন্‌টা তাই খুঁজে বের   রা হোক।"

তারপর কৃপাচার্য   র্যাধ• .ক বললেন, "ভীষ্মের কথা সত্য। একদি ক   গুবদের যেমন খোঁজ করতে হবে অন্যদিকে তেমনি আর একটা বিশেষ কাজ করতে হবে। পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাস শেষ করলেই কিন্তু ওরা নিজেদের রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করবে। তাই, আমাদের এখন উচিত হবে নিজেদের ধনসম্পত্তি, শক্তি এবং রাজনীতি সব কিছু সঠিকভাবে রক্ষা করা ও বৃদ্ধি করা। শক্তিশালী এবং দুর্বল রাজাদের আমাদের পক্ষে টেনে নিতে হবে। এখনই যদি এসব ব্যবস্থা করতে পারি তবেই পাণ্ডবদের পক্ষে যে সব রাজারা যাবে তাদের আগে থেকেই দুর্বল করে রাখতে পারব এবং পরে সহজেই ওদের পরাস্ত করে সুখী জীবন যাপন করতে পারব!" (চলবে)

শিবপুরাণ

দুই

ব্রহ্মার বর পেয়ে শঙ্খচূড় তাঁর আদেশ অনুসারে বদ্রিকাশ্রমে গিয়ে তপস্যারত এক কন্যাকে দেখে অনুমান করল, এই সেই তুলসী। তার দিব্য-সৌন্দর্য দেখে শঙ্খচূড়ের মনে তার প্রতি মোহ সৃষ্টি হোল, আকর্ষণ জাগল।

শঙ্খচূড় সেই কন্যার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সুন্দরী, কে তুমি? কার কন্যা তুমি? কেন আছ এই বনে?"

তুলসীও শঙ্খচূড়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে জবাব দিল, "আমি ধর্মধ্বজ নামক রাজার কন্যা। যাতে এক মহান বীরের সাথে আমার বিয়ে হয় এবং আমি যাতে এক মহান পতিব্রতা হিসেবে যশলাভ করতে পারি তারই জন্য তপস্যা করছি। কিন্তু আপনি কে?"

"আমি দম্ভ নামক দানব রাজার পুত্র। আমার নাম শঙ্খচূড়। আমি ব্রহ্মার কাছে তপস্যা করে তিন লোকের উপর অধিকার স্থাপনের বর পেয়েছি। ব্রহ্মাই আমাকে আদেশ দিয়েছেন, তোমাকে বিয়ে করার জন্য। সেই জন্য আমরা পতিপত্নী রূপে সুখে থাকতে পারব।"

তারপর ওরা গান্ধর্ব্য বিধি অনুসারে বিবাহ করে, কাছের পাহাড়ে, নদীতে ও বন-জঙ্গলে বিহারে বেরুলো। পরে শঙ্খচূড়ের বাড়ি গেল। তারপর যে সব ঘটনা ঘটল শঙ্খচূড় বিস্তারিত ভাবে তা বাবা দম্ভকে, নিজের স্ত্রীকে এবং শুক্রাচার্যকে বলল। তারা সবাই খুবই আনন্দিত হোল। তারপর দম্ভ, শুক্রাচার্যের অনুমতি নিয়ে শঙ্খচূড়ের রাজ্যাভিষেক করালো। শঙ্খচূড় শুক্রাচার্যের কাছে পরামর্শ নিয়ে নিজের রাজ্যে ভাল

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

ভাবেই শাসন পরিচালনা করছিল। তার বাবার চেয়ে বেশি যশ পেল। একবার দানবকুলের বিশিষ্ট লোকেরা এবং শুক্রাচার্য শঙ্খচূড়কে বলল, "হে রাজা, ব্রহ্মা তোমাকে অনেক বর দিয়েছেন। তোমার পূর্বপুরুষদের প্রতি ইন্দ্র-প্রমুখেরা অনেক ক্ষতি করেছে। দেবতাদের ঐ অপকর্মের প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব এখন তোমার উপর পড়েছে। তাই, তুমি প্রথমে নিজের সেনাদের নিয়ে স্বর্গে আক্রমণ পরিচালনা কর। দেবলোকে নিজের অধিকার স্থাপনা কর।"

শঙ্খচূড় শুক্রাচার্যের উপর ভার দিল, আক্রমণ করতে বেরুনোর শুভ মুহূর্ত দেখতে।- তারপর সেই শুভ মুহূর্তে রওনা হয়ে স্বর্গে আক্রমণ চালনা করে।

গুপ্তচরদের মাধ্যমে ইন্দ্র আগে-ভাগেই জানতে পারেন যে শঙ্খচূড় আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তাই ইন্দ্র সমস্ত দেবতাদের ডেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন।

দেবতাগণ ও দানবগণের মধ্যে দীর্ঘ চল্লিশ দিন এক টানা রাত দিন যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের মাঝে মাঝে পিছু হটা, দেবতাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও দানবদের মধ্যে তা দেখা গেল না। দানবরা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করতে থাকলে অবশেষে দেবতারা ভয়ে পালিয়ে যেতে থাকে।

নিজের সেনাদের পালাতে দেখে ইন্দ্র ভাবলেন তাঁর পরাজয় নিশ্চিত। তাঁর মনে পড়ল শঙ্খচূড়কে দেওয়া ব্রহ্মার বরের কথা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজের যোদ্ধাদের সরিয়ে ইন্দ্র শঙ্খচূড়ের কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি মহর্ষি কশ্যপের সন্তান রূপে আবির্ভূত হয়েছ। আমি তোমার শৌর্য ও পরাক্রমে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। তুমি এই তিন লোকে শাসন কর। আমরা সবাই তোমাকে সাহায্য করব।"

এই কথার জবাবে শঙ্খচূড় বলল, "ইন্দ্র, তুমিই আমার প্রতিনিধি হয়ে আমার মত অনুসারে স্বর্গে শাসন পরিচালনা কর।" তারপর শঙ্খচূড় ঘোষণা করল যে সেই

তিনটি লোকের অধিপতি। সে নিজের রাজধানী শোনিতপুরে ফিরে এলো। সেখান থেকেই সে তিনলোকে শাসন করত। ইন্দ্র প্রমুখেরা প্রত্যেকদিন ওর কথা মত কাজ করে যেত।

কিন্তু যাগযজ্ঞ যারা করত তারা ইন্দ্রের নামেই তা যথারীতি করে যাচ্ছিল। এর ফলে শঙ্খচূড়ের ভীষণ রাগ হোল। সে দানবগণকে ডেকে আদেশ দিয়ে বলল যে যতদিন না ঋষি এবং ব্রাহ্মণরা দানবদের কাছে নিজেদের সমর্পন করছে ততদিন ওদের পর্যুদস্ত করে মার। এই আদেশ পেয়ে দানবগণ যন্ত্রতন্ত্র যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান লণ্ডভণ্ড করতে লাগল। তার ফলে ঋষিগণ তিক্ত-বিরক্ত হয়ে সমস্ত ঋষি একত্রে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে বলল, "প্রভু, শঙ্খচূড়ের জ্বালায় আর থাকতে পারছি না। অতঃপর, আপনি তাকে বধ করে আমাদের রক্ষা করুন।"

"আমার অংশ থেকে শঙ্খচূড়ের জন্ম। তুলসী আবার লক্ষ্মীর অংশ থেকে জন্ম গ্রহণ করেছে। সেইজন্য আমি শঙ্খচূড়কে বধ করতে পারি না। তোমরা শিবের দ্বারস্থ হও।" বিষ্ণু ঋষিদের পরামর্শ দিলেন।

ফলে সমস্ত ঋষি ছুটল কৈলাসে। শিবের কাছে প্রার্থনা করল শঙ্খচূড়ের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য। শিব তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন যে শঙ্খচূড়কে তিনি বধ করবেন। এই কথা বলে শিব ওদের ফেরত পাঠালেন।

এই খবর পেয়েই নারদ শঙ্খচূড়ের কাছে গিয়ে বললেন, "ওহে, শঙ্খচূড়, স্বয়ং শিব ঋষিদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে তোমাকে বধ করবেন। হঠাৎ রুদ্রগণ সহ শিবের আক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার আগেই তুমি কৈলাশ আক্রমণ করে শিবকে পরাজিত কর।"

শঙ্খচূড় নারদের পরামর্শ অনুসারে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে কৈলাশ আক্রমণ করে। এসব লক্ষ্য করে শিব শঙ্খ-

চূড়ের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি নিলেন। নন্দীর মাধ্যমে ভদ্রকালী, ভদ্রগণ এবং কুমারগণকে ডেকে পাঠালেন। সবাই হাজির হোল। তারপর, রূদ্রগণ এবং দানব সেনাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হোল।

অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলতে লাগল কিন্তু শঙ্খচূড়ের সেনারা কমছে না দেখে শিবের আশ্চর্য লাগল। শিব বিষ্ণুকে স্মরণ করে তাঁর আগমনের পর এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, "অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলছে অথচ শঙ্খচূড়ের বাহিনীর লোক কমছে না কেন? কি ব্যাপার?"

ঐ কথায় বিষ্ণু বললেন, "শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসীর পাতিব্রত্যের জোর আছে। ঐ জোরেই রক্ষিত হচ্ছে শঙ্খচূড়ের সেনারা। আমি যাচ্ছি তুলসীর পাতিব্রত্য নষ্ট করতে। তারপর তুমি শঙ্খচূড়কে বধ করতে পারবে।

বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে শঙ্খচূড়ের বাড়ি গিয়ে তুলসীকে বললেন, "শিবের সাথে এখনও যুদ্ধ চলছে। তোমাকে দেখিনি অনেকদিন, তাই চলে এলাম।"

তুলসী ঐ কথা বিশ্বাস করে সেই নকল শঙ্খচূড়ের সাথে ঘর করল। স্বামীর মত তাঁকে গ্রহণ করল। সঙ্গে সঙ্গে তুলসীর পাতিব্রত্য নষ্ট হয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ শঙ্খচূড়ের সেনারা ব্যাপক হারে মারা যেতে লাগল। শিব ত্রিশূল দিয়ে শঙ্খচূড়কে বধ করলেন।

যে রাত্রে বিষ্ণু তুলসীর পাশে ঘুমোচ্ছিলেন সেই রাত্রে তুলসী লক্ষ্য করল বিষ্ণুর আসল রূপ। কারণ ঘুমন্ত অবস্থায় ছদ্মরূপ খসে পড়ে। নিজের চোখে ভরে দেখল তুলসী। ক্ষোভে দুঃখে তুলসী বিষ্ণুকে পাথর হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দিল।

"তুমি গণ্ডক নদী হয়ে যাবে। আমি শালগ্রাম শিলা হয়ে ঐ নদীতে আবহমান কাল ধরে থাকব। তোমার নামের তুলসী গাছ সারা দেশ জুড়ে পূজিত হবে।" এই কথা বলে বিষ্ণু তাকে নিয়ে গোলকে চলে গেলেন। (চলবে)

২ / বিশ্বনাভি

এই চিত্রের নিচের অংশে স্থিত বৃত্ত সমূহের মাঝের বৃত্তকে চীনের সম্রাট "স্বর্গবেদী" নামে অভিহিত করতেন এবং সেখানে প্রার্থনা করে হবিষ্য ছাড়তেন। তাঁর দৃষ্টিতে এটা বিশ্বের নাভি প্রদেশ। এই বৃত্তের আশপাশের সমগ্র অঞ্চলের উপরের অংশ রাজমহলের প্রাঙ্গন।

ফটো : মালতী বি, ভানসালী

পুরস্কৃত টীকা

তৃষ্ণার তুষ্টি

পুরস্কার প্রেরক
সুনীতি কুমার মুখার্জী
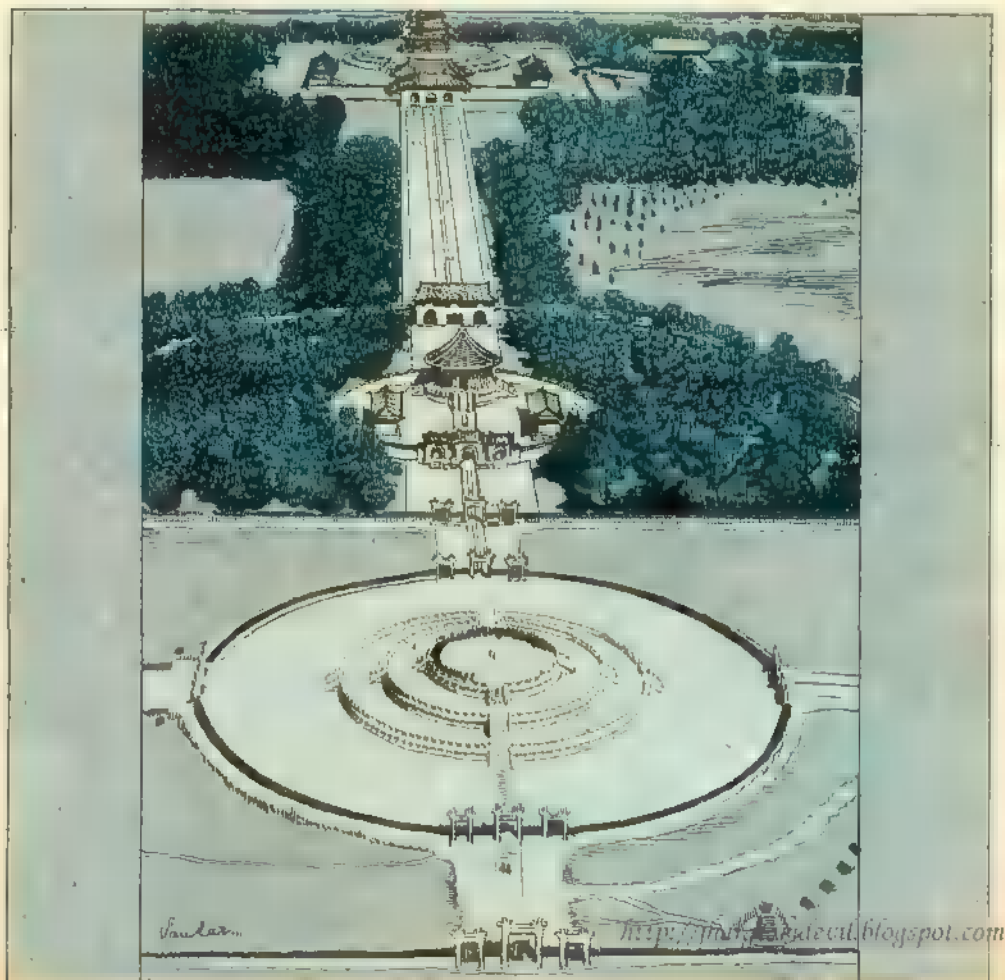
ফটো : মদন গোপাল

১০/৪ সি. মনোহর পুকুর রোড
কলিকাতা-২৬

ক্ষুধার পুষ্টি

টীকা

ফটো-পরিচিতি-টীকা প্রতিযোগিতা :: পুরস্কার ২০ টাকা

★ পরিচয়-টীকা ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছানো চাই।
★ পরিচয়-টীকা দু-তিনটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটো-টীকার মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। পোস্ট-কার্ডেই টীকা লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত পরিচয়-টীকা সহ বড় ফটো নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।
★ সফল পরিচয়-টীকা প্রতিযোগীর ঠিকানায় কুড়ি টাকা পাঠানো হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

কুমিরের ডিম

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

কুমির-ছানা

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'
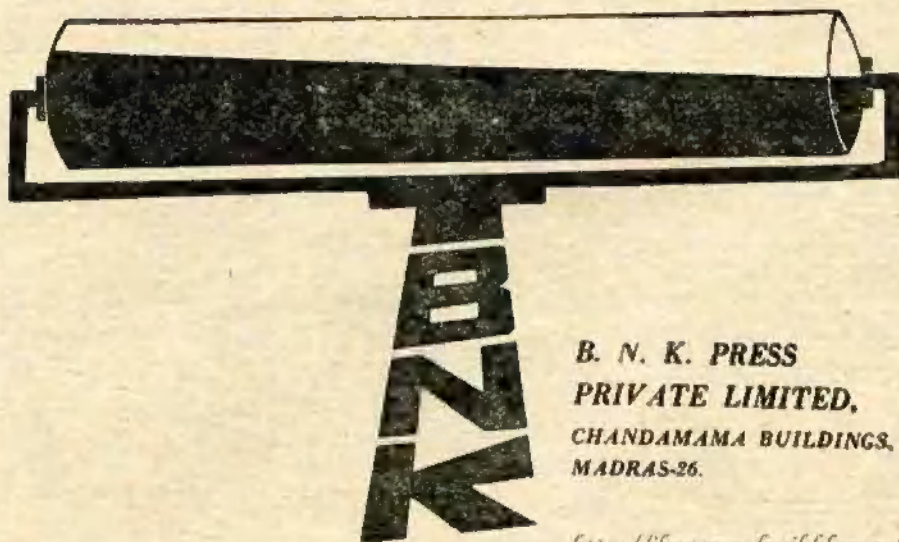
ঘরে ঘরে সবার প্রিয়
লিপ্টনের
হিমালয়ান
গোল্ডেন
ডাস্ট চা
সত্যিকারের ভালো চা,
ঠিক আপনার মনের মতন
LIPTON'S
GOLDEN DUST TEA

Photo by : **SURAJ N. SHARMA**

শিবপুরাণ